রাত্রি ছিল পিশাচের

কবিতা সিংহ

নিউ বেঙ্গল
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

RATRI CHHILO PISHACHER

A Bengali Novel

By

KABITA SINHA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস্. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দিলাপ দাস

প্রথম সংস্করণ
শুভ ১লা বৈশাখ
১৩৭০

দাম
৯·০০

রাত্রি ছিল পিশাচের

সোমনাথ গাড়ি ড্রাইভ করছিল। শীতের সন্ধ্যা। শ্যামবাজারের মোড়টা ধোঁয়াশায় আবছা হয়ে আছে। দুপাশের দোকানের আলোগুলো দূর থেকে লালচে দেখাচ্ছে। ড্যাস্‌বোর্ডের খানিকটা আলো চল্‌কে পড়েছে সোমনাথের টানা ছাঁদের মুখে। সোমনাথ শিশিরের সঙ্গে কথা বলছিল। শিশির ওর পাশের সিটে বসে শুনছিল মন দিয়ে।

রীতিমতো ঠাণ্ডা পড়েছে। তার ওপর গাড়ি শ্যামবাজারের মোড় পেরিয়ে যখন একটু ফাঁকায় বরানগরের দিকে ছুটল, তখন বাতাসের ঠাণ্ডা ছুরিতে শরীরের খোলা অংশগুলো যেন কেটে কেটে যাচ্ছিল। শিশির তার গরম শালটা গলার চার পাশে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল—

—আচ্ছা সোমনাথ, এতদিন তোর সঙ্গে আলাপ, এর আগে তো তুই কোনোদিন আমাকে অশনি চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে যাসনি, আজ হঠাৎ অশনি চৌধুরীর বাড়ি আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন ?

সোমনাথ বলল, কারণ আছে। নাহলে সত্যিকথা বলতে কি অশনিদা তো তেমন মিশুকে প্রকৃতির মানুষ নন। উনি সবার সঙ্গে তেমনভাবে মিশতেও পারেন না। আমার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠবার পরেও তাই তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিইনি।

শিশির বলল,—আমরা যখন প্রেসিডেন্সীতে থার্ডইয়ারে-টিয়ারে পড়ছি, অশনি চৌধুরী তখন পড়ছেন ইউনিভার্সিটিতে। ফাইনাল ইয়ারে। খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন তাই না ?

সোমনাথ বলল – হ্যাঁ, ব্লু ছিলেন। তার পর এম. এ. পাস করে বিলেতে যান। আরো পড়াশুনো করেন। কিন্তু ফিরে এসে ওই নিজের লাইব্রেরিতেই পড়ে থাকেন। আর মাঝে মধ্যে দেখবি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। দেশের প্রায় সমস্ত লার্নেড সোসাইটির মেম্বার। আর এনথ্রপলজি, থিয়জফি এবং অকালট্ সায়েনসের সমস্ত সেমিনার ওঁর এটেণ্ড্ করা চাই-ই। দারুণ ভালো শিকারী আর এ্যাডভেঞ্চার করার বাতিক আছে। বহু বিষয়েই অশনিদার ইণ্টারেস্ট। আর অঢেল সময়ও পান হাতে। চৌধুরী প্যালেসের ছেলে ভাই। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকেন। আমাদের মতো তো চাকরি করে দিন গুজরান করতে হয় না।

শিশির বলল,—কিন্তু আজ আমাকে হঠাৎ আটকালি কেন? দিব্যি তো তোদের বাড়ি থেকে দুপুরের খাওয়ার নেমন্তন্ন সেরে পালাচ্ছিলাম।

—বা রে, আমি অশনিদাকে ফোনে বলেই নিয়েছি। উনি বললেন শিশিরকে আজ আমাদের বাড়ি নিয়ে এসো। উনি তো এমনি তোকে নামেও চেনেন পরিচয়ও জানেন। তুই যে আমার সেই ইস্কুল-বয়সের বন্ধু, তাও তো ওঁর অজানা নয়। তবে আজ কেন এই বিশেষ আমন্ত্রণ সেটা তোকে খুব শর্টে বলে রাখি। আজ অবশ্য অশনিদার ওখানে তোর ভূমিকা মুখ্য নয়। কিন্তু তোর পরামর্শ, তোর সঙ্গও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বরাহনগরের প্রায়ান্ধকার অঞ্চল দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিল। দু-পাশে শুকনো পাতা পোড়া আর কাঁচা নালার গন্ধ। সোমনাথ বলল—আসলে ব্যাপারটা খুব গভীরে। তোকে শর্টে গল্পটা বলি।

বেশ কিছু বছর আগের কথা বলছি। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে আমি বাবার সঙ্গে আসানসোলের একটি কয়লাখনিতে গিয়েছিলাম? জায়গাটার কাছাকাছি একটি চমৎকার হেল্‌থ রিসর্ট ছিল, সেখানে ওঁদের কয়লাখনির অফিসারদের জন্য কয়েকটি লাক্সরি বাংলো ছিল। সেখানেই আমরা আস্তানা গেড়েছিলাম। আসলে জায়গাটির প্রাকৃতিক

সৌন্দর্যের জন্যই আমাদের যাওয়া। কিন্তু আর একটি অন্তর্নিহিত কারণও ছিল। সেটা হল, ওই খনি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি 'পিট'-এ নানারকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছিল। কয়েকটি পরিত্যক্ত 'পিট'-এ অশরীরী সব মূর্তি দেখা যেত। বহু শ্রমিককে টেনে নিয়ে যেত সব অপচ্ছায়া। অনেকে মারাও যেত। এই সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, বাবার বন্ধু মনীশকাকু কয়েকজন বিশেষজ্ঞদেরও নেমন্তন্ন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন অশনিদা। এছাড়া আর একটি ছেলেকেও দেখতাম। কোথাকার যেন জমিদারের ছেলে। চেহারাটি ভারি সুন্দব। নাম শোভন। সে-ও এসেছিল মনীশকাকুর সঙ্গে তার জ্যাঠামশায়ের বন্ধুতার সূত্রে। শোভনের চেহারাটি ছিল একটু কবি কবি ধরনের। বেশ ভাবপ্রবণ আর একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। আমাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। কিন্তু নেহাতই ভাসা ভাসা আলাপ। অশনিদাকে শোভন খুব পছন্দ করত। একবার অশনিদার খুব বিপদ ঘটল। তাঁকে সারাদিন কোথাও পাওয়া গেল না। সবাই হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। ক্রমশঃ রাত ঘনিয়ে এলো। অশনিদার আর কোনো পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত সবাই সন্দেহ করতে লাগল যে অশনিদা নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছেন। তখন শোভন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে সামনের খালি জমির মাটিতে একটা কাঁচা ধরনের ম্যাপ এঁকে নিল খনি-অঞ্চল আর পিট-এর। তারপর তার ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসল। সেই হাত আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। চলতে চলতে একটা পিট-এর কাছে এসে থামল। ও তখন উঠে একটা দু-ডালওয়ালা গাছের শাখা নিয়ে, তার দুটি ডাল ধরে হাঁটতে লাগল মোহাবিষ্টের মতো। আমরাও ওর পিছন পিছন চললাম। খানিকক্ষণ বাদে মনে হতে লাগল গাছের ডালটা ওকে আকর্ষণ করছে যেন। এ ভাবেই ছুটতে ছুটতে ও একটা খনির শেষপ্রান্তের পিটের মুখে এসে দাঁড়াল। অশনিদাকে পাওয়া গেল সেই পিট-এ। তলায় পড়েছিলেন তিনি। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল। কোনো জ্ঞান ছিল না। পরে

জানা যায় একটি অশরীরী ছায়া তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পিটের দিকে। একটা লোহার সিঁড়িও দেখিয়ে দিয়েছিল। সিঁড়িটা খানিক দূর গিয়ে আর নেই। পুরো সিঁড়িটাই ছিল জং-ধরা। অশনিদা নামতে যেতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তিনি ভিতরের একটা খাঁজে আটকে ছিলেন বলেই একদম তলায় পড়ে যান নি।

এই ঘটনার পর থেকেই আমরা তিনজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বিশেষ দিনটি ছিল চব্বিশে নভেম্বর। সেই থেকে অশনিদা বলতেন ২৪শে নভেম্বর আমার পুনর্জন্মের দিন। আমরা ঐ দিনটিতে তিনজনে একসঙ্গে গল্প করে খাওয়া দাওয়া করে কাটাতাম। একবার শোভন ভারতের বাইরে ছিল, তখন ও টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছিল। আর একবার আমি দিল্লী ছিলাম। মনে আছে প্লেনে এসে অশনিদার বাড়িতে দিনটি উদ্‌যাপন করে গিয়েছিলাম। আজও সেই দিন।

শিশির হেসে বলল,—তা ভাই তোদের তিনজনের এই ঘনিষ্ঠ ভাব-সম্মেলনের দিনে হঠাৎ আমাকে কেন?

—কারণ আছে রে! অশনিদাই সব বলবেন। এই যে আমরা এসে পড়লাম, এই যে, সামনেই দেউড়ি।

সোমনাথের গাড়িটা তখন বাঁক নিয়ে একটা মস্ত বন্ধ দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে। দেউড়ির মাথার আলোটা জ্বলে উঠতেই দেখা গেল ত্বপাশে শানাই ঘর, রশুনচৌকি বসানোর জায়গা। দেউড়ির ওপর মস্ত মস্ত জোড়া সিংহ-দাঁড়ানো। দেউড়ির লোহার গেট খুলে যেতেই গাড়ি ঢুকলো ভিতরে। সেলাম করে দাঁড়াল দারোয়ান।

লম্বা ড্রাইভ দিয়ে এগিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো গাড়ি-বারান্দার তলায়। নানারকম অর্কিড্ আর লতাপাতায় সাজানো সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে গেল ত্বজনে। ভিতরে কাচের দরজা পেরিয়ে দীর্ঘ লাউঞ্জ। তারপর মস্ত বসবার হল। বিশাল আবলুশ কাঠের চওড়া সিঁড়ি—অর্ধচন্দ্রের মতো উঠে গেছে দোতলায়। তার প্রথম ধাপেই দাঁড়িয়ে আছে একটি বিনীত চেহারার প্রবীণ লোক।

—কি শ্রীমন্তদা, অশনিদা কোথায় ?

হাতজোড় করে শ্রীমন্ত বলল,—নমস্কার দাদাবাবু। উনি আপনাদের জন্য ওপরে অপেক্ষা করছেন। যান, চলে যান।

শিশির মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। বিরাট বাড়ি। ঝাড়লণ্ঠন মূর্তি কিউরিওতে সারা বাড়িটা যেন একটা মিউজিয়মের চেহারা নিয়েছে। কার্পেটের নরম আচ্ছাদনী দেওয়া সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওপরে উঠে এলো দুজন। সোমনাথ আর শিশিরের পেছন পেছন শ্রীমন্তও আসছিল।

সোমনাথ বলল,—নীচে যখন গাড়ি দেখলাম না, তখন মনে হয় শোভন এসে পৌঁছায় নি।

শ্রীমন্ত পিছন থেকে বলল,—শোভনদাদাবাবু আজ আর আসবেন বলে তো মনে হয় না দাদাবাবু। আমি দু-বার ফোন করেছিলাম। একবার তো কেউ ফোন ধরলই না। আর একবার ফোন করতে আমাদের দাদাবাবুর নাম করে ডাকলাম। তাতে কে একজন যেন বলল, —উনি খুব ব্যস্ত আছেন, এখন ফোন ধরতে পারবেন না।

সোমনাথ অবাক্ হয়ে বলল,—সে কী ? কি বলছ তুমি শ্রীমন্ত ?—অশনিদার নাম করার পরে এই কথা বলল ?

—হ্যাঁ দাদাবাবু! আমি বরং যাই আপনাদের জন্য একটু কফি নিয়ে আসি।

সোমনাথ আর শিশির সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের পর ঘর, করিডোরের পর করিডোর পেরিয়ে চলল। এতরকম পুরোনো আসবাব পেন্টিং, ধাতুর জিনিসপত্র, ভারি ভারি ফার্নিচার, যে শিশিরের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সারা বাড়িতে একটি দুটি ভৃত্য ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

সোমনাথ বলল,—এ বাড়ির এই মহলটা অশনিদা মিউজিয়ম করে দেবেন বলে সাজাচ্ছেন। পরিবারটি এখন খুবই ছোট হয়ে গেছে ওঁদের। ওঁর তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই বিদেশে। দাদা বৌদি মারা গেছেন বহুদিন হল। ভাইপো নিশানাথ আমেরিকায় পড়াশুনো করছে। ফিরতে এখনো বছর চারেক দেরি। এখানে আছেন

শুধু অশনিদা আর পিসিমা। অশনিদার বাবা-মাও মারা গেছেন ছোট বয়সে।

—অশনিদা বিয়ে করেন নি?

—এখনো করেন নি। পিসিমা তো রোজ এইসব নিয়ে রাগারাগি করেন।

একটা ঝুলন্ত বারান্দা পেরিয়ে দুজনে আর একটা মহালে এসে পৌঁছোল। সুন্দর একটি লতাপাতায় ঢাকা বারান্দা। কাচের শার্শি বন্ধ করে জায়গাটি ঘিরে আপাততঃ ঘরের মতো করে নেওয়া হয়েছে। লতাপাতা আর অর্কিড দিয়ে সাজানো চমৎকার জায়গাটি। গোল গোল জাপানী ফানুসের মতো আলো জ্বলছে। রট্ আয়রনের সুন্দর সুন্দর বসার জায়গা। তাতে রঙিন রঙিন ভেলভেটের গদি লাগানো। একটিতে বসেছিলেন অশনিনাথ।

শিশির আর সোমনাথকে ইশারায় বসতে বললেন তিনি। শিশিরের মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে দেখা অশনিনাথের সেই দৃপ্ত চেহারাটি। দীর্ঘ, ছিপছিপে টানটান। তীক্ষ্ণ নাক। একটু বসা, টানা টানা চোখ। জোড়া ঘন ভ্রূ। এখন কপালের চুলগুলি ঈষৎ সরে গিয়ে প্রশস্ত কপাল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের রেখাগুলি আরো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আরো মহিমময়। চকিতে শিশিরের মনে পড়ল সেই ইউনিভার্সিটি ব্লু পেয়ে, রিসেপসনে দাঁড়ানো, সাদা স্যুট পরা, ছেলেমানুষী মুখটা। সে মুখটি যেন এই পরিশীলিত মুখের মধ্যে হারিয়ে গেছে। অশনিনাথ বললেন,—শিশির এসো, অনেক গল্প শুনেছি তোমার সোমনাথের কাছে। আজ দুপুরে সোমনাথকে ফোন করতে, ও যখন বলল, তুমি আছো ওখানে তখনই ওকে বলে দিয়েছিলাম তোমাকে ধরে আনতে।

শিশির হেসে বলল,—অশনিদা আমি আপনার দারুণ অ্যাডমায়ারার। আপনাকে সোমনাথ নিশ্চয়ই সে কথা বলেছে।

অশনিনাথ মাথা নেড়ে অল্প হাসলেন। একটি চন্দন কাঠে খোদাই-করা টেবিলের চারপাশে বসবার আসন তিনজনের। বাইরে গাঢ় ঠাণ্ডা। মেঘলা আঁধার। ভিতরটা বেশ গরম। আরাম লাগছিল

বেশ। অশনিনাথের পরনে কালো ভেলভেটিনের একটি হাউস কোট। সোমনাথের পরনে হালকা বিস্কিট রঙের সাফারী স্যুট, গলায় চেনে বাঁধা একটি ব্রঞ্জের ওঁ কার। শিশিরের পরনে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী আর পেস্তা রঙের একটি কাশ্মিরী শাল।

সোমনাথ বলল,—অশনিদা, শুনলাম শ্রীমন্ত শোভনকে ফোন করেছিল।

অশনিনাথ বললেন,—হ্যাঁ ও একবারও নিজে ধরে নি। তুমি একবার ট্রাই করো না সোমনাথ।

পাশেই একটি ব্রঞ্জের ত্রিপয়ে সেকেলে মডেলের পিতলের ফোন আর রিসিভার রাখা ছিল। সোমনাথ ফোন করল।

—হ্যালো! শোভন সান্ন্যালকে একটু ডেকে দিন না?

—কি বললেন? উনি ব্যস্ত? আসতে পারবেন না?

—উনি নেই?···আশ্চর্য, কত রকমের কথা বলছেন আপনি? —ধ্যেৎ—।

ফোনটা খটাং করে রেখে দিল সোমনাথ। তার ভ্রূ দুটি বিরক্তিতে জুড়ে গেল একটু। অশনিনাথের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—আমি স্পষ্ট শুনলাম, প্রচুর লোকজন কথা বলছে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে। যে লোকটি ফোন ধরেছিল, তার তো দেখলাম কোনো কথারই ঠিক নেই।

অশনিনাথের ভ্রূ দুটি চিন্তায় ঈষৎ জুড়ে গেল। ইতিমধ্যে কফি এসে গেলো।

শ্রীমন্তর ট্রে থেকে কফি নিয়ে সিপ করতে করতে অশনিনাথ বললেন,—ছ্যাখো শিশির, আজকের এই দিনটা আমরা তিনজনে কখনো মিস করি না। এই দিনে কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও শোভন এলো না, এটা কি করে সম্ভব হলো বলো তো?

সোমনাথ বলল,—অশনিদা, বরং সমস্ত ঘটনাটা শিশিরকে খুলেই বলা যাক। আপনিই বলুন বরং—

শোনো শিশির, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অশনিনাথ বললেন—শোভন সান্ন্যাল ছেলেটি বয়সে সোমনাথেরও কিছু ছোট। ওর ভিতর দারুণ

একটা সাইকিক্ পাওয়ার আছে। একবার—

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলল,—সে কথা আমি শিশিরকে আগেই বলেছি অশনিদা। আপনাকে সেভ করার সেই কাহিনী—

অশনিনাথ বললেন—বেশ, তারপর থেকেই বলি, শোনো—ওদের পরিবারের অনেক পূর্ব-পুরুষেরও সাইকিক পাওয়ার ছিল। তবে ওদের পরিবারটা যাকে বলে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে। ওরা হল, লক্ষ্মীপুরের রাজ ফ্যামিলির বংশধর। সাতপুরুষ আগে থাবাতেই ওদের বংশের লতাপাতা বমতে শুরু করে। বহুধারা নদীর মতো এক একটি ধারা শুকিয়ে যেতে থাকে। আর সেই নির্বংশ পরিবারের ধন-রত্ন ক্রমশঃ বর্তাতে থাকে ওদের বংশে। আমি আর সোমনাথ লক্ষ্মীপুরে কয়েকবার গেছি। পাহাড়, নদী, ঝরনা আর বনে ঘেরা ভারি সুন্দর জায়গাটি। চোখ জুড়িয়ে যায়। তা, লক্ষ্মীপুরের সান্ন্যাল বংশে তন্ত্রের একটা ধারা চলতে চলতে ওদের পিতৃপুরুষ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। এক পুরোহিত পরিবারের সঙ্গে ওদের পুরুষপরম্পরায় শত্রুতা ছিল। সেই পরিবারের লোকেরা ওদের বংশের অনেককে অপঘাত মৃত্যুর শিকার করেছে। কিন্তু সেই পরিবারটির শেষ বংশধর মারা যায়, শোভনের ঠাকুর্দার বন্দুকের গুলিতে। শোভনের বাবা অবনীভূষণ সান্ন্যাল বিদেশী শিক্ষায় মানুষ। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের দ্বারা লজিক দ্বারা পরিচালিত। তার কাকাও তাই। ওঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কারণ ওই পুরোহিত পরিবারটি নানাভাবে সান্ন্যাল পরিবারকে দোহন করছিল। পুরোহিত পরিবারের সমস্ত পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আনন্দে, শুনেছি শোভনের দাদু নাকি তাঁর জমিদারিতে বিরাট মুক্তির উৎসব করেছিলেন।

শোভন যখন জন্মালো দেখা গেল—ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটছে। শোভনের মৃগীরোগ ছিল। ও মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেত। খুব দুর্বল চেহারার ছেলে ছিল শোভন। একবার ওদের লক্ষ্মীপুরের চোরাবালির উপরে শোভন বেড়াতে বেড়াতে ডুবে গিয়েছিল প্রায়। সঙ্গে ছিল ওর কাকা। সে

সময়ে এক পাহাড়ী জাতের শিকারী ওকে উদ্ধার করেছিল। শিকারীটির নামটি ভারী অদ্ভুত 'শারমা'। এই লোকটি কোন্ দেশীয় ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয়। তবে লোকটি বলে যে ও কামরূপ কামাখ্যার সাধক, আর ওর চেহারাতেই 'মোঙ্গল' ছাপ যথেষ্ট প্রবল। এই শিকারীটি ক্রমশ শোভন আর শোভনের কাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আমিও শারমাকে শোভনের বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। ক্রমশ দেখা গেল শারমার আসল পেশা শিকার নয়, গুরুগিরি। রীতিমতো বিদেশেও ঘুরে এসেছে সে। বিরাট লটবহর শিষ্য সামন্ত নিয়ে ঘোরাফেরা করে। টাকা-পয়সার সোর্সও যথেষ্ট লোকটার।

কিন্তু শোভনদেব পরিবারে, এখন আমি যত পর্যবেক্ষণ করছি ততই দেখছি রীতিমতো কালসাপ হয়ে ঢুকেছে এই 'শারমা'। ওদের পরিবারে ঢোকার পর থেকে এই 'শারমা'র শিষ্য বনে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল সবাই। ওর বাবা মারা গেলেন অস্বাভাবিকভাবে। কাকীমা মারা গেলেন তারপর। কাকাও ওর হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণভাবে চলে গেলেন। ওর মাও মারা গেলেন কিছুদিন পরে। শোভনের দিদির সব কটি ছেলেমেয়ে টুপ-টাপ্ ঝরে পড়ল কিছুদিন বাদে, বাদে। এখন প্রায় বাড়ি খালি। ওর নিরীশ্বরবাদী কাকার সঙ্গে শোভনও চব্বিশ ঘণ্টা তন্ত্রমন্ত্র আরম্ভ করেছে শুনলাম। কিছুদিন আগে খবর পেলাম ওর কাকার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। বিশাল সম্পত্তি নিয়ে তিনি নয়ছয় করতে আরম্ভ করেছেন। শোভন যে এভাবে শারমার খপ্পরে পড়বে তা আমরা ভাবিনি। অবশ্য ও চিরকালই কোমল মনের ছেলে। শোভনকে ভালোবাসে একটি ফুলের মতো মেয়ে। তার নাম সুরভি। সেই সুরভির সঙ্গেও শোভন আর সম্পর্ক রাখে না। আমাকে এড়িয়ে যায়। সোমনাথের সঙ্গেও কথা বলে না।

সোমনাথ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল,—অথচ আপনার মনে আছে অশনিদা, শোভন প্রথম প্রথম শারমাকে একদম সহ্য করতে পারতো না। ওর প্রাণ বাঁচানো সত্ত্বেও বলত, শারমা কাকাকে জাদু করেছে।

অশনিনাথ বললেন,—কেন? তোমার শোভনের ছোট পিসিকে

মনে নেই ? শারমাকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। তিনি কেমন হয়ে গিয়েছিলেন শেষের দিকে ?

সোমনাথ বলল,—অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন পিসিমণি। বয়স বেশী না। শোভনের চেয়ে বড় জোর বছর পাঁচেকের বড় হবেন। বেশির ভাগ সময়েই বিদেশে থাকতেন। একসপেরিমেন্টাল সাইকলজির ডক্টরেট। শারমা এলে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে উপুড় হয়ে পড়তে দেখলে রেগে যেতেন। শারমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন না বলে শোভনের কাকার সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শারমা এসব দেখে শুধু বলেছিল, ওকে একবার আমার আস্তানায় পাঠিয়ে দিও শুধু। আস্তানা মানে ওর বিভিন্ন শিষ্যদের বাড়ি। সেবারে বোধহয় শারমা এসে উঠেছিল গড়িয়ার কোনো ধনী লোকের বাড়ি। একদিন অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে পিসিমণিকে নিয়ে যাওয়া হল শারমার আস্তানায়। ব্যস্! সেখানে যে কি ঘটল কে জানে। পিসিমণি আর ফিরলেন না। তিনি ওই কুৎসিতদর্শন আধবুড়ো লোকটাকে বিয়ে করে বসলেন। এবং ওর কাছেই রয়ে গেলেন। মাস ছয় বাদে উনি মারা যান। শারমা বলে ওঁর ভাব-সমাধি হয়েছিল। শোভনের কাকা বলেন যে উনি দিব্যোন্মাদ হয়েছিলেন।

শিশিরের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এলো; —কি সর্বনাশ !

অশনিনাথ রঙিন গালার কাজ করা চুরুটের বাক্স থেকে একটি চুরুট বের করে বললেন—সর্বনাশই বটে। আমার কেমন যেন ধারণা এবার শোভনকে ঘিরেই বিপদটা ঘনিয়ে উঠছে। শোভনকে আমাদের বাঁচাতেই হবে !

শিশির বলল, অশনিদা, একটা ছোট প্রশ্ন করি আপনাকে, আচ্ছা এই শোভনের বাবার মৃত্যু হয়েছিল কি করে ?

শোভনের বাবা শেষ পর্যন্ত ছিলেন এই শারমার বিরোধী। তিমি বিশ্বাসই করতেন না যে শারমার কোনো অলৌকিক শক্তি আছে। শারমা তাঁর ওপর শেষপর্যন্ত দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মীপুরের কাছাকাছি একটি তন্ত্রপীঠ আছে। মহাকঙ্কালী নাম জায়গাটির। সেখানে

একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি মন্দির আছে। চারপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথর। লোকে বলে এই পাথরগুলো নাকি মহাকঙ্কালীর দান। এই মহাকঙ্কালীটি যে কি তা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। যার যেমন বিশ্বাস সে তেমনভাবে মহাকঙ্কালীকে ব্যাখ্যা করে। সিঁদুরমাখা অদ্ভুত একটা পাথর। কেউ বলে কালী, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ধর্মঠাকুর, আবার কেউ বলে আদিবাসীদের কোনো দেবতা। 'টাঁড়'। সেখানে নরবলিও হতো শোনা যায়। হঠাৎ অমবস্যার রাতে শোভনের বাবার মতো অবিশ্বাসী লোক কেন যে এই মহাকঙ্কালীর মন্দিরে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। কঙ্কালী মন্দিরের থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মারা যান। শারমা বলে তাকে অবিশ্বাস করার জন্যই এইভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার ধারণা তাঁকে মন্দির থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল হয়তো। তিনি পরদিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। একজন গ্রামবাসী কাঠ কুড়োতে গিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করে। তখন তিনি শুধুমাত্র বলতে পেরেছিলেন, পাহাড়ের মতো ছাগল···

সোমনাথ বলল,—কথাটার কোনো মানে হয় না! কিংবা হয়তো লোকটা ভুল শুনেছিল······

অশনিনাথ বললেন, যদি ভুল শুনে থাকে তাহলে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু যদি ঠিক শুনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন এর অর্থ আমরা খুঁজে পাবোই! আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? চলো না আজ আমরা শোভনের নাকতলার বাড়িতে যাই।

শিশির বলল, হ্যাঁ সেই-ই ভালো। আজ যাবার একটা ছুতো থাকবে!

অশনিনাথ শিশিরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে বলল,—কথাটা তুমি মন্দ বলোনি শিশির। সেই ভালো। চলো ডিনার খেয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ি।

সোমনাথ বলল,—এত রাতে সেই নাকতলা পেরিয়ে আপনি যাবেন অশনিদা? আমার কেমন লাগছে।

অশনিনাথ বললেন,—জানো শিশির, সোমনাথ আসলে ভয় পাচ্ছে। ও ভাবছে যদি শোভনের ওখানে আমি অপমানিত হই!…নাও সোমনাথ, আমার মান অপমানের চেয়ে শোভনের ভালো মন্দের প্রশ্নটা অনেক জরুরী। একটি পিয়ানোর মতো সুশব্দের ঘণ্টা বাজালেন অশনিনাথ। শ্রীমন্ত এসে দাঁড়াল,—দাদাবাবু, খাবার ঘরে চলুন, সব রেডি।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছিল আকাশের জমাট বাঁধা মেঘে। এই মেঘলা ভেদ করে মাঝে মাঝে উঠছিল শীতের হাওয়া। অশনিনাথের হিস্পানো গাড়িটা সেই চাপ চাপ অন্ধকার চিরে ছুটছিল ময়দান দিয়ে। হঠাৎ জানলার ওঠানো কাচে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির ছাট এসে লাগলো। সোমনাথ বলল,—বৃষ্টি নামলো। অবশ্য ভাবনার কারণ নেই। শ্রীমন্ত তিনটে ছাতা আর ওয়াটার প্রুফ দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে।

অশনিনাথ বললেন,—একে ভূত চতুদর্শীর রাত তায় বৃষ্টি। শীতটা তো এমনিই বেশ পড়েছে। তায় বৃষ্টিতে রীতিমতো জাঁকিয়ে উঠবে মনে হয়।

সোমনাথ বলল,—অশনিদা আপনার তো সবদিকে বেশ খেয়াল থাকে! আজকাল তো আমরা কেউ আর বাংলা তারিখের হিসেব রেখে চলি না! কি শিশির তুমি চলো নাকি?

শিশির বলল,—সোমনাথ, তোদের পাড়ায় কি কালী পূজো-টুজো হয় নাকি?

সোমনাথ বলল,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো হয়। সত্যি সেটা খেয়াল করিনি তো।

অশনিনাথ হেসে বললেন—আসলে ভূত চতুর্দশীর দিন পিসিমার দৌলতে এখনো আমায় চোদ্দ শাক খেতে হয় কিনা? তাই মনে আছে।

ময়দান পেরিয়ে গাড়ি তখন মধ্যবিত্ত পাড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

শিশির বলল,—আচ্ছা নাকতলার কোন্ জায়গায় শোভনের বাড়ি?

—নাকতলায় ঠিক নয়। পেরিয়ে গিয়ে আরো দূর। ওদের অরিজিনাল বাড়ি পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি। অসলো স্ট্রীটে। এই নাক-

তলার বাড়িটা একটা অতি পুরোনো বাগান বাড়ি ধাঁচের। প্রায় শ' খানেক বছর বয়স হবে। শোভনের কোনো প্রপিতামহ-টহ তৈরী করেছিলেন। বাড়িটা তো ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল। আমরা মাঝেমধ্যে গেছি। পিকনিক-টিকনিক হতো। আসলে নাকি তন্ত্র সাধনার জন্য করা।

সোমনাথ বলল,—আরে, আপনার কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একদিন, এই কয়েক মাস আগেই আমি শোভনদের ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে ব্যবসার কাজেই ড্রাইভ করে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে অনেক বাইরের লোক ছিল, —দেখছিলাম বাড়িটায় মিস্ত্রি লেগেছে। রিনোভেট হচ্ছে। শোভন বোধহয় এখন থেকে ওই বাড়িতে পাকাপাকিই থাকবে স্থির করেছে।

ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকার দুপাশ চেপে আসছিল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। জলের ধারা আছড়ে পড়ছিল জানলার কাচে। উইণ্ড্ স্ক্রীনের ওপর ওয়াইপার না চালালে সামনের পথ দেখা যাচ্ছিল না। দুপাশে এখন খোলামেলা জমি। একটি দুটি ছোটখাটো বাড়ি বা ছাউনি ছড়ানো রয়েছে। অন্ধকারে ডুবে আছে চারিদিক। অশনিনাথ বললেন—ডান দিকটা একটু লক্ষ্য রেখো সোমনাথ। সেই উঁচু ইটখোলার চিমনির পাশ দিয়ে শোভনদের বাড়িতে যাবার রাস্তা।

সোমনাথ বলল—হ্যাঁ অশনিদা, আমি লক্ষ্য রাখছি। খানিকদূর এগোতেই জটবাঁধা অন্ধকারের গায়ে আলো পড়তেই ইটখোলার তলার দিকটা আলোকিত হয়ে উঠলো। অশনিনাথ তাঁর 'হিস্পানো'টা দ্রুত ঘুরিয়ে নিলেন। গাড়িটা দ্রুত চলল দুপাশের আগাছাভরা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে খোয়ার রাস্তা ধরে। সামনের অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা জায়গা কূর্ম পৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর একটি-দুটি আলোর বিন্দু!

ওই তো শোভনদের বাড়ি!

গাড়ি আরো কাছে যেতেই দেখা গেল, কতকগুলো গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে আছে। শোভনের বাড়িটাও দেখা গেল। শিশিরের মনে হলো

উঁচু দেয়ালঘেরা দুর্গের মতো একটা বাড়ি। ওপরে মসজিদের ডোমের মতো গোল একটা গঠন। তার মাথায় উঁচু একটি শূন্যের মতো স্ট্যাণ্ডে জ্বলছে নীলচে বেগুনী একটি আলো। আলোটি তেমন জোরালো নয় বলে দূর থেকে দেখা যায় নি।

সোমনাথ অবাক্ কণ্ঠে বলল,—আরে! সেই খোলামেলা বাগানবাড়ির এ কী চেহারা দাঁড়িয়েছে অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন—সত্যিই তো। এ যেন মিডলইস্টের মস্ক দুর্গের মতো চেহারা নিয়েছে।

একটু তফাতে একটা ঝুপসি অশ্বত্থ গাছের তলায় গাড়িটি প্রায় লুকিয়েই রাখলেন অশনিনাথ। মৃদু নিশ্বাস ছেড়ে গাড়িটা থামলো। সেই শব্দটুকুও হারিয়ে গেলো বৃষ্টির ঝমঝম ধ্বনিতে। ছাতা মাথায় বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে নামলো তিনজন। তাতে শরীর বাঁচলো বটে। কিন্তু পা ডুবে গেল নরম ঠাণ্ডা কাদায়। পাশেই পেছনের কম্পাউণ্ডের উঁচু দেওয়াল। দেওয়াল ধরে ধরে সামনের বন্ধ গেটের কাছে পৌঁছলো তিনজনে। গেটের মুখে কুলুপ লাগানো। বার বার নক করার পর গেটটি অল্প খুলল। বর্ষাতি পরা দারোয়ান সেই ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল,—কার্ড দেখান!

অশনিনাথ গায়ের জোরে গেটটি আরো উন্মোচিত করে বললেন,—কি বাজে কথা বলছো? আমি অশনিনাথ চৌধুরী, শোভনের বাড়ি ঢুকতে আমার কোনো কার্ড লাগে না। দারোয়ানকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে অশনিনাথ বলেন—এসো সোমনাথ, শিশির এসো।

রোগাটে চেহারার লম্বা মানুষটার একটি ঠেলায় যে এতদূর ছিট্‌কে পড়বে দারোয়ানটা তা সে নিজেই ভাবেনি। উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অশনিনাথরা দ্রুতপায়ে বাগানের পথ পেরিয়ে ঢাকা প্যাসেজে গিয়ে উঠলেন। প্যাসেজটা দীর্ঘ লম্বা হয়ে গেছে বড় হলের দিকে। প্যাসেজের মুখটা লম্বা একটা টানেলের মতো। বাড়ির ভিতরে যাবার এই একমাত্র দরজাটা এত সঙ্কীর্ণ করে বানানো হয়েছে কেন তা কে জানে? আর দূরে সেই দরজার মুখে বসে আছে

একটা দীর্ঘ চেহারার বীভৎস মানুষ। তার শরীরটা সম্পূর্ণ বেঢপ। হাত পাগুলো লম্বা, পেকাল। মুখটা যেন একটা নরমুণ্ডের ওপর চামড়ার আস্তর লাগানো! লোকটি কেমন অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে আছে। নিগ্রো না মোঙ্গল ঠিক বোঝা যায় না। মুখের পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাঁ করা। ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে হলদে উঁচু দাঁতগুলো। চোখেব দৃষ্টিটা নিম্নমুখী। তাতে কোনো জ্যোতি নেই। ঠাণ্ডা লালচে একটা রং। তার মধ্যে কালো কালো ভাবলেশহীন দুটি অক্ষিতারা। নিষ্ঠুর কালো ঠাণ্ডা মৃত্যুর মতো সেই নিম্নমুখী চোখ দেখলে কিন্তু বোঝা যায় লোকটি অদ্ভুতভাবে যেন অলক্ষ্য থেকেই ওদের লক্ষ্য করছে। সে লক্ষ্যের আর যেন কোনো অবধি নেই। খানিকক্ষণ থিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শিশিররা। এমন কি অশনিনাথও। তারপর, আবার সোজা হয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এগোলো শিশির আর সোমনাথ। যতই লোকটির কাছাকাছি আসতে লাগলো ওরা ততই কেমন যেন একটা পচা গন্ধ নাকে এসে লাগতে শুরু করল। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে দুহাত ছড়িয়ে রুখে দাঁড়ালো লোকটা। মনে হলো যেন একটা বিরাট শকুন জাতীয় পাখি ডানা বিস্তার করে উড়ে আসছে। লোকটা মাটিতে না শূন্যে, বুঝতে না বুঝতেই অশনিনাথ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে হটিয়ে ওদের নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। ভিতরে গিয়েই সামনে পড়ল একটি অদ্ভুত চেহারার লোক। লোকটি বোধ হয় চীনা। আধো আধো ইংরেজীতে লোকটা বলল, আপনারা কোথায় যেতে চাইছেন?

অশনিনাথ বললেন—শোভন সান্ন্যালকে ডেকে দিন। বলুন অশনিনাথ চৌধুরী ডাকছেন।

লোকটি পিছনের দরজাটি আটকে রেখে বলল,—উনি এখন ব্যস্ত আছেন। আসতে পারবেন না।

অশনিনাথ সঙ্গে সঙ্গে সতেজে বললেন,—উনি যদি না আসতে পারেন তাহলে আমরা, ভিতরে চলে যাবো।

সোমনাথ ইতিমধ্যে পর্দার ফাঁক দিয়ে হয়তো শোভনকে একপলক

দেখে থাকবে। সে হঠাৎ ডেকে বসল, শোভন,—শোভন, এদিকে শুনে যাও !

শোভন তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসতেই চীনা লোকটি অভিযোগের সুরে নীচু গলায় তাকে কিছু বলল। শোভন তার উত্তরে চাপা গলায় কিছু বলতেই সে পর্দা তুলে ভিতরে চলে গেল।

শিশির এই প্রথম শোভনকে দেখল। রোগা ছোটখাটো ফর্সা ছেলেটি। নরম মোলায়েম। কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক ভঙ্গী তার। ভাবলেশহীন চোখ মুখ। অশনিনাথ আর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে খুব পোশাকী ভঙ্গীতে বলল,—আরে আপনারা ?

—হ্যাঁ, অবাক্ হলে নাকি,—ইনি শিশির, সোমনাথের ছোটবেলার বন্ধু।

হাতজোড় করে নমস্কার করে চাপা গলায় শোভন বলল,—খুব খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

শিশিরের কিন্তু শোভনের ভাবভঙ্গীর আড়ো-আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব দেখে কখনই মনে হচ্ছিল না যে শোভন অশনিনাথ বা সোমনাথের অতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হঠাৎ অশনিনাথ বললেন,—শোভন, এতো করে মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আজ আমার ওখানে গেলে না ! আজকের তারিখটার কথা মনে আছে তোমার ?

শোভন হাঁ না-র মাঝামাঝি একটা উত্তর যেন দেবার চেষ্টা করল। সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল—আচ্ছা শোভন প্রায় বছর খানেক হল তুমি আর তেমন যোগাযোগ রাখছ না কেন ? আমরা কি কোনো কারণে তোমায় কোনো রকম আঘাত দিয়েছি।

শোভন কোনো কথার উত্তর না দিয়ে দু-জনের মুখের দিকেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো।

অশনিনাথ আবার তীব্রকণ্ঠে বললেন,—শোভন এ কী পোশাক পরেছ তুমি ?

শোভনের পরনে খয়েরী রঙের পাঞ্জাবী আর লুঙ্গী।

পোশাকের কাপড়গুলি মাড়ে খড় খড় শব্দ করছে।

শোভনের চোখের দৃষ্টিটা ক্রমশঃ যেন কেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল। সে বলল,—বসুন, বসুন আপনারা। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের দেয়াল ঘেঁসে রাখা সারি সারি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে শোভন বলল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত একটি লোক। লালচে বাদামী ত্বক চকচক করছে তৈল মসৃণতায়। মুখটি বড়। একটা থলথলে চামড়ার থলির মতো। তাতে পুঁথির মতো দুটি চোখ তেরছা করে বসানো। ভ্রূ প্রায় নেই বললেই চলে। চোখের ওপরের পাতার মাংস ভারি হয়ে ঝুলে পড়েছে। তলায়ও দুটি কমলার কোয়ার মতো মাংসের পুঁটুলি। ফোলা গাল চোয়ালের পাশ দিয়ে ঝুলছে। মোটা মোটা কালো ঝোলা দুটো ঠোঁট। পরনে জমকালো পোশাক। ঘোর খয়েরী রঙের ওই একই ধরনের পোশাক, তবে সমস্তটাই মূল্যবান সিল্কের। লোকটির চারপাশের আবহাওয়াটাই এমন অদ্ভুত ধরনের যে কাউকে বলে দিতে হয় না যে এই শারমা। শারমা এসে শোভনকে-স্পর্শ করে দাঁড়াতেই শোভন যেন নিজের সেই ভাবলেশহীন আত্ম-বিস্মৃতির জগতে ফিরে গেল। শারমা কেমন যেন গান গাওয়ার মতো মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে বলল,—তুমি কি ভুলে গেলে শোভন, এখুনি আমাদের উৎসব আরম্ভ হবে! উৎসবে তোমাকে দরকার।

শারমাকে যেন অস্বীকার করেই অশনিনাথ বললেন,—সে কী, তোমার এখানে উৎসব হচ্ছে, আর তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করে নি শোভন?

শোভন কি যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার কথার উপরই শারমা আবার বলল, চলো শোভন, অতিথিরা অপেক্ষা করছেন! ওঁদের পরে কোনদিন আসতে বলে দাও।

শোভন কলের পুতুলের মতো শারমার পিছন পিছন ঘুরে গেল। পর্দা সরিয়ে সে ঢুকলো পরের ঘরে। পর্দা পুরোটা উঠে যেতেই দেখা গেল,

পরের ঘরটিতে বেশ কয়েক জোড়া জুতো আর একটি লম্বা ধরনের বেতের ঝাঁপি রাখা আছে। তারও পরের ঘরটিতে কোনও পর্দা নেই। সে ঘরের অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। সার সার খাবার টেবিল। তাতে স্তূপাকারে নানা রকম আহার্য সাজানো। স্ত্রী-পুরুষেরা ঘোরাঘুরি করছেন সে ঘরে। বেশ কয়েকজনকেই দেখা গেল। তা অন্ততঃ জনা কুড়ি তো হবেই।

সোমনাথ বলল,—চলুন অশনিদা। শোভন তো আমাদের রীতিমতো অপমানই করল। আমরা এবার ফিরে যাই। আর কখনো যদি শোভনের সঙ্গে……

সোমনাথের কথা শেষ হতে না হতেই অশনিনাথ হঠাৎ শোভনকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,—চলো শোভন, আমি তোমার অতিথিদের সঙ্গে একটু আলাপ করি।

শরমা বা শোভন অশনিনাথকে বাধা দেবার আগেই তিনি অতিথিদের ঘরে চলে গেলেন। সোমনাথ আর শিশিরও চলে এল তার পেছু পেছু। হঠাৎ ওদের সামনে এসে পড়ল বেশ কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ! নানা দেশের মানুষের এমন মিশ্র ভিড় শিশির এর আগে কখনো দেখে নি। সোমনাথ হঠাৎ শিশিরকে ঠেলা দিয়ে বলল,—ওই মেয়েটিকে দ্যাখ! কি অপূর্ব সুন্দরী!

—সুন্দরী?

শিশির দেখতে লাগলো। বীভৎস মুখের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই তো ভিড় বেশী। তার মধ্যে খয়েরী জোব্বা ধরনের একটি ঢোলা পোশাক পরে পানীয়ের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। তাকে দেখলে মনে হয় এত ভঙ্গুর সৌন্দর্য যেন আর হয় না। পৃথিবীর কোনা পাপ যেন কখনো স্পর্শ করতে পারে না তাকে। এমন একটি মেয়েকে এই শারমার দলে দেখে আঘাত পেল শিশির। ঠিক তখনই যেখানে জুতো রাখা ছিল সেদিক থেকে কেমন একটা ছটফট শব্দ উঠে এলো। শারমা শোভনকে সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। দীর্ঘ লাফ দিয়ে অশনিনাথ ছুটে গেল সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। মেয়েটির হাত চলকে পানপাত্রটা

পড়ে যেতেই তীব্র দেশী মদের গন্ধ উঠতে লাগল চারিদিক ছাপিয়ে। পানপাত্রটা তুলতে গিয়ে পোশাকে জড়িয়ে পড়ে গেলো সে। কনুয়ের ভাঁজে ঝোলানো সোনার তারে বিনোনো তার ছোট্ট পার্স টা পড়ে গেল সবার অলক্ষ্যে মাটিতে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি সেটা তুলে মেয়েটিকে দিতে গিয়ে দেখে মেয়েটি যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। অশনিনাথের ফেটে পড়া চিৎকার শুনে সোমনাথ আর শিশির ছুটলো তাঁর কাছে। তিনি তখন সেই দীর্ঘ ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে ধরে চিৎকার করে বলছেন,—শোভন, এ কি—এ কি ?

শিশির তাড়াতাড়ি এসে সোমনাথের সঙ্গে উঁকি মেরে দেখল ঝাঁপির ভিতরে শোয়ানো রয়েছে একটা মৃতদেহ। দেহটি কোনো দরিদ্র পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের। হঠাৎ যেন একটি ফুঁয়ে সমস্ত বিদ্যুৎ বাতি নিভে গেল। তালগোল পাকানো অন্ধকারে সারা বাড়িতে জেগে উঠলো একটা বিশৃঙ্খলা।

সৌভাগ্যবশতঃ শিশির সোমনাথ আর অশনিনাথ খুব কাছাকাছিই ছিলেন। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন,—শীগগির বেরিয়ে চলো। গাড়িতে গিয়ে উঠি। অশনিনাথ ও সোমনাথ তো ভালো স্পোর্টসম্যান্। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ধুতি পাঞ্জাবি পরা শিশিরও কোনো অংশেই কম নয়। ছুটে গিয়ে লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে বাগানের পথ দিয়ে আধখোলা গেট ছাড়িয়ে তারা ছুটতে লাগলো। ঝুপসি বটগাছটার তলায় এসে গাড়ির লক্ খুলে দ্রুত স্টার্ট নিলেন অশনিনাথ। শিশির আর সোমনাথ উঠে পড়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার আগে গাড়ি খোয়া রাস্তায় উঠে পড়ল। শব্দহীন ছুটন্ত নেকড়ের মতো এক লাফে উড়ে গিয়ে যেন ধরে ফেলল বড় রাস্তা।

খানিকটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যখন লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়ল গাড়িটা, তখন যেন খানিকটা সম্বিত ফিরে পেল সবাই। অশনিনাথ বললেন,—গলা একবারে শুকিয়ে গেছে, কোথায় একটু গলা ভেজানো যায় বলো তো সোমনাথ !

সোমনাথ বলল,—এখন তো রাত প্রায় সাড়ে বারোটা, পানের

দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে অশনিদা। কোথাও কিছু পাবেন না।

হঠাৎ অশনিনাথ গাড়িটি বাঁকিয়ে ঢুকলেন পাশের একটি সরু রাস্তায়।

সোমনাথ বলল,—হঠাৎ এ রাস্তায় কেন অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন,—হঠাৎ মনে পড়লো এ রাস্তায় একটা ছোট্ট আশ্রম আছে। আর কালীমন্দির। পিসিমার গুরুপুত্রের আশ্রম। চলো, ওখানেই যাই। একটু জল যদি পাওয়া যায়।

সোমনাথ বলল,—এত রাতে এই বর্ষায় ওঁরা কি জেগে আছেন?

শিশির হেসে বলল,—তুমি আবার ভুল করলে সোমনাথ, কাল কালীপূজো না। নিশ্চয়ই আশ্রমে এখন পূজোর আয়োজন চলছে!

অশনিনাথ বললেন,—কিন্তু কি আশ্চর্য, হঠাৎ এই আশ্রমের কথাটা আমার স্মরণে এলোই বা কি করে? সেই কবে, কলেজে পড়ার সময় পিসিমার সঙ্গে ওঁর গুরুদেবের জন্মতিথিতে এসেছিলাম। তারপর এই কাছাকাছি বড় রাস্তা দিয়ে কত জায়গায় কতবার গেছি, একবারও তো স্মরণে আসে নি এই জায়গাটার কথা। শোভনের বাড়িতেই তো কতবার গেছি। আশ্চর্য!

শিশিরের কথাই ঠিক। আশ্রমের সামনে গাড়ি থামতেই বাগানের মাঝখানে ছোট ছোট কুটিরগুলিতে কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল। টিউবওয়েলের কাছে জল ভরছিল কেউ। অশনিনাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে জলপান করলেন। সোমনাথ আর শিশিরও জল খেল আকণ্ঠ। আশ্রমকর্তা এখন অতিবৃদ্ধ। অশনিনাথ তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিতেই তিনি কাছে টেনে নিলেন তাঁকে। শিশির আর সোমনাথ গালিচায় বসল। কিছুক্ষণ বসার পর হঠাৎ অশনিনাথ স্বামীজিকে প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা আজ রাতে বারোটা থেকে কি কোনো বিশেষ যোগ পড়েছে?

—যোগ? কই না তো? কোনো শুভযোগ তো পড়ে নি বাবা!

—আচ্ছা, যদি বলি কোনো অশুভ যোগ?

স্বামীজি হঠাৎ চমকে উঠলেন। ভালো করে তাকালেন অশনিনাথের দিকে। মনে হলো তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের তিনজনের কপাল

দেখছেন। তারপর কম্পিতগলায় বললেন,—ওসব কথা উচ্চারণ করাও পাপ। যাও, মন্দিরে গিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এসো। একটা ঘর খুলে দিচ্ছি, আজকের রাতটা থেকে যাও এখানে। আজ রাতে আর তোমরা আশ্রমের বাইরে যেও না বাবা।

অশনিনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—উপায় নেই। ফিরতে হবে স্বামীজি। আমাদের এক বন্ধুর খুব বিপদ। আপনি যখন বলছেন, তখন মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই যাই।

স্বামীজি বললেন, বেশ, তাই যাও!

অশনিনাথ, সোমনাথ আর শিশির যখন গাড়িতে উঠছেন, তখন একজন সন্ন্যাসী সেবক এসে ওঁদের কিছু প্রসাদী ফুল, আর মিষ্টি সমেত মোড়ক দিলেন।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

অশনিনাথ সোমনাথ আর শিশিরকে উদ্দেশ করে বললেন,—সাহস আছে, আবার ফিরে যাওয়ার?

সোমনাথ বলল,—কোথায়?

- শোভনের বাড়ি।

—কেন থাকবে না।

—তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি, তবু বলি, আমাদের বন্ধু শোভনের এখন ঘোরতর বিপদ।

—সে কি? কি বিপদ?

সোমনাথ বলল,—আজ রাতে একটা অশুভ যোগ আছে। শুনলে তো। হয়ত সেটা মাঝরাত থেকেই শুরু। তাই শারমা অত তাড়াহুড়া করছিল। ওই মৃতদেহটা তো তোমরা দেখলে। কোনো দরিদ্র অভাগা চণ্ডালের মৃতদেহ। হয়তো লোকটাকে খুনই করা হয়েছে। আজ রাতে শবসাধনার কোনো ব্যাপার ছিল কিংবা এখনও আছে। শারমা আজ রাতের কাণ্ডকারখানাতে যদি সফল হয় তাহলে শোভন হয়তো আমাদের কাছ থেকে চিরকালের মতে দূরো চলে যাবে। শোভনকে আমাদের বাঁচাতেই হবে সোমনাথ—শিশির।

শিশির হতবাক হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। একটু থেমে সে বলল,—নিশ্চয়ই! কিন্তু বাঁচাবার উপায়টা কি?

অশনিনাথ বললেন,—উপায় একটাই শিশির। শোভনকে ওর বাড়ি থেকে, ওই পরিবেশ থেকে তুলে আনতে হবে। যাকে সাদা কথায় বলে, কিডন্যাপ্ করা। জিনিসটা হয়তো বেআইনী হবে। কিন্তু তা ছাড়া যে আর কোনো উপায় নেই শিশির! শোভন ওদের পরিবারের শেষ বংশধর। যে কোনো মূল্যেই ওকে বাঁচাতে হবে। আমি ভুলতে পারি না যে, শোভনও একদিন আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল!

সোমনাথ বলল,—চলুন অশনিদা এখুনি ফিরে যাই। কালী-টালি জানি না, তবে একটা শুভশক্তিকে তো সর্বদাই বিশ্বাস করি। আমরা তো কোনো অন্যায় করছি না। সুতরাং সেই শুভশক্তি আমাদের সঙ্গে ঠিকই থাকবে।

অশনিনাথের নিঃশব্দ হিস্পানো একটুও ঝাঁকুনি না দিয়ে সুপার ভাবে বেঁকে আবার উড়ে চলল পুরোনো পথ দিয়ে।

থেমে গেছে। একটা হাড়-কাঁপানো হাওয়া। ওপরে কালো নিশ্ছিদ্র আকাশে থমথম করছে অন্ধ মেঘের দল। সেই ঝুপসি বটগাছ তলায় একটা চকচকে কালো বাঘের মত লুকিয়ে পড়ল হিস্পানোটা। আবার নামলেন অশনিনাথ। সোমনাথ আর শিশিরও নামলো। অশনিনাথ বললেন—একেবারে অস্ত্রহীন নই কিন্তু। সঙ্গে একটা ছোট্ট কোল্ট আছে। সুতরাং জীবন্ত কিছু বিপদ এলে যুঝে যেতে পারবো। আবার সেই উঁচু দেওয়ালের গা ঘেঁষে হেঁটে যাওয়া। হাঁটতে হাঁটতে গেট। গেট বন্ধ। উঁচু পাঁচিল ডিঙানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আবার দেওয়াল ধরে ধরে বাড়ির রান্নাঘর চাকরদের ঘরের দিকে পৌঁছোলো ওরা। সমস্ত বাড়ির কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। আলো নেই। অন্ধকারে দাঁড়ানো সার সার গাড়িগুলোও উধাও।

চাপা গলায় অশনিনাথ বললেন,—যদ্দূর মনে পড়ে পিছনের কিচেন গার্ডেনের দিক দিয়ে একটা খিড়কি পথ ছিল। একটু এগিয়ে দেখা

যাক, খিড়কিটিও বন্ধ। কিন্তু ঈষৎ নীচু হওয়ায় টপ্‌কে পেরোনো সম্ভব হল। বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে চারিদিকে আবার ঘোরা। কোনো দরজা, কোনো জানলাই খোলা নেই! শেষ পর্যন্ত পিছনের একটি বাথরুমের কাচের জানলার খানিকটা রিভলভার দিয়ে ঠুকে ভেঙে ফেললেন অশনিনাথ। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানিটা টেনে খুলে ফেললেন। বাথরুমের জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পা থেকে জুতো খুলে ফেললেন তিনি। সোমনাথ আর শিশিরও খুলল! তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে একটি বড় করিডোরে গিয়ে পড়ল তারা। ইলেকট্রিকের মিটারবক্সটাই পাগলের মতো খুঁজছিলেন অশনিনাথ। পুরোনো বাড়িতে সদরের পাশেই ছিল সেটা। সোমনাথ বলল,—আজকাল অনেক সময় সিঁড়ির তলায় মিটারবক্স করে।

অশনিনাথ বললেন,—আমার যদ্দূর ধারণা ওরা আর মেন্ অন্ করে নি। মেন স্যুইচটা সম্ভবতঃ যেখানে ডেড্ বডিটা রাখা ছিল তারই কাছেপিঠে কোথাও।

অন্ধকারে সোমনাথ একবার লাইটার জ্বালালো! লাইটারের আলোয় তারা সামনেই দেখতে পেলো খাবার হলটা। দ্রুত হলটা পেরিয়েই সেই ছোট ঘরটি। ঘরের কোণেই ইলেকট্রিকের মিটারবক্স। সোমনাথ ছুটে গিয়ে স্যুইচ অন্ করে দিতেই সারা বাড়িটা আবার আলোয় ঝলমল করে উঠল।

কিন্তু কোথায় কেউ নেই। সেই ঝাঁপিটিও খালি। তাতে কোনো মৃতদেহ নেই।

ওরা আবার খাবার ঘরে এলো। খাবার ঘরে সারি সারি টেবিল সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল। সব টেবিলেই সেই অদ্ভুত খয়েরী রঙের কড়কড়ে মাড় দেওয়া কাপড় পাতা! মাঝের টেবিলে অদ্ভুত সাঙ্কেতিক নক্‌শায় খাবার সাজানো। ভার ভার মাংস। নানা রকমের মাংস। আর বড় বড় মাটির পাত্রে চোলাই দেশী মদ রাখা। পাশে পানপাত্র সাজানো। এমন খাবার জায়গায় দৃষ্টিকটু-

ভাবে যেন শোভা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মড়ার খুলি আর বাহু ও পায়ের সাদা হাড়।

অশনিনাথ সমস্ত ঘরটা ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করতে লাগলেন। শিশিরের মনে হল অশনিনাথ খুব গভীরভাবে কি যেন ভাবছেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন,—রক্ত—রক্ত দিয়ে এই সব কাপড় ছোপানো হয়েছে।

সোমনাথ চমকে উঠে বলল—সে কী?

—হ্যাঁ, আর এইগুলো খুব জটিল তান্ত্রিক প্যাটার্ন! এই যে, যে-ভাবে খাবারের পাত্রগুলো সাজানো হয়েছে। আর এই সব লতা-পাতা, ফণি-মনসা, গোলা সিঁদুর এ-সব নানা রকম তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে লাগে। চলো, আমরা সারা বাড়িটা ঘুরে দেখি। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, ওদের কোনো তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কোনো ইনার সার্কেলে শোভনকে অভিষিক্ত করার ব্যাপার ছিল আজকে। যে করেই হোক শোভনকে আমাদের বাঁচাতে হবেই।

সোমনাথ বলল,—এক কাজ করা যাক, শিশির, চলো আমরা দুজন নীচের তলায় দুদিকে যাই। অশনিদা, আপনি দোতলাটা দেখুন।

অশনিনাথ বললেন,—ঠিক আছে!

তিনি ছুটে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। শিশির আর সোমনাথ দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার খাবার ঘরে ফিরে এলো শিশির আর সোমনাথ। নীচের তলায় কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। ওরা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। সিঁড়ির মুখেই অশনিনাথ। তিনি বললেন,—দোতলায়ও কেউ নেই। চলো, তিনতলায় যাওয়া যাক।

—তিনতলায় তো একটা ফাঁকা গম্বুজের মতো দেখছিলাম, ওখানে কি কোনো লোকের থাকার সম্ভাবনা আছে অশনিদা?

— চলই না। এতটা যখন এলাম, তিনতলাটাও একটু হয়ে যাই।

তিনজনে অপেক্ষাকৃত সরু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠল। সরু ঘোরানো প্যাসেজ পেরিয়ে গেলে ঘর। ঘরের ওপরটা ঠিক ডোমেরই

মেতা, কিন্তু অন্ধকার। ভিতরে হাতড়ে হাতড়ে স্যুইচ বোর্ডের আলোগুলো জ্বেলে দিতেই সারা ডোমটা ঝলমল করে হেসে উঠলো। তিনজনেই ওপর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলো আসলে এটা একটা অবজারভেটরি। একটা অতিকায় টেলিস্কোপ বসানো আছে। ঘরের মেঝের ওপর নানা ধরনের চিহ্ন আর দাগ টানা আছে। দেয়ালের গায়ে সার সার সাজানো বই আর প্রাচীন পুঁথি। ডোমের ভিতরের দেয়ালের রং রাত্রি নীল। তার গায়ে কিছু কিছু তফাতেই মারকারি আলোর গুচ্ছ লাগানো।

অশনিনাথ বললেন,- আমার কেমন সব আবছা স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমি মাঝে শোভনদের লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করতে যেতাম। ওখানে আলাদা একটা পুরোনো ধুলোপড়া কোণ মতো জায়গায়, একটা পুরোনো আলমারিতে···হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে, আলমারিটা নাকি পঞ্চাশ ষাট বছর খোলাই হয় নি। শোভনরা নাকি ওটার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। ওর কোনো তান্ত্রিক পূর্বপুরুষের পুঁথিপত্র ছিল। আমি আলমারিটা খুলে তার মধ্যেকার পুঁথিপত্রগুলো খানিকটা উলটে পালটে দেখেছিলাম। ঝুরঝুরে সব পুঁথি। পিশাচতন্ত্রের নানারকম সাধনা কর্মকাণ্ডের কথায় ভর্তি।···কিন্তু তখন আমি আর তেমন কোনো ইন্টারেস্ট নিই নি। আমার অন্য কাজ ছিল। সব মনে পড়ছে···এই সব চিহ্ন, এই সব সঙ্কেত···সত্যি!

সোমনাথ বলল,— তার মানে অশনিদা আপনি বলতে চান···

অশনিনাথ বললেন,—হ্যাঁ আমি বলতে চাই আজ একটা ইভল্ দিন। অশুভ সময়। আজ পৈশাচিক কাজকর্মের উপযুক্ত কোনো মুহূর্ত। শোভনের চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে কিন্তু। আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না ওরা শোভনকে সরিয়ে ফেলল কোথায়? এই টেলিস্কোপটার মধ্যে দিয়ে একটু আকাশ দেখতে চাই। যদি কোনো বিশেষ সঙ্কেত খুঁজে পাই!

শিশির বলল,—আকাশ তো মেঘে মোড়া।

অশনিনাথ বললেন,— তবু একবার দেখি না! এত ভালো টেলি-

স্কোপ দেখে আমার খুবই লোভ লাগছে। মনে হচ্ছে এটার স্ট্রেংথ কতটা দেখি।

অশনিনাথ টেলিস্কোপটার দিকে এগোলেন।

ঠিক তখনই অদ্ভুত ধরনের একটা বাসী গন্ধে সারা গোল গম্বুজ ঘর ভরে উঠল। মনে হতে লাগলো উজ্জ্বল মারকারি আলো কেমন যেন হালকা নাইলনের ধাঁচের বাষ্পীয় আবরণে ঘিরে গেছে। যেমন রৌদ্রালোকিত কোনো জায়গায় হালকা মেঘের ছায়া পড়লে অদ্ভুত লাগতে থাকে। অশনিনাথ এগিয়ে গিয়ে টেলিস্কোপটির মুখের ঢাকনিটা খুলতে গেলেন। তখন সেই বাসী গন্ধটা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। এবং ক্রমশঃ মারকারি ল্যাম্পের উজ্জ্বলতা আরো কমে আসতে লাগলো। অশনিনাথ আপনিই ফিরে এলেন টেলিস্কোপটা ছেড়ে। তিনি এসে দাঁড়ালেন সোমনাথ আর শিশিরের পাশাপাশি। গন্ধটাকে এবার ক্রমশঃ চেনা যাচ্ছিল। পচা জীবজন্তুর গন্ধ। পচা গলিত মাংসের। গন্ধ যত বাড়ছিল তত কমছিল আলোর তেজ। আর ক্রমশঃ বাড়ছিল অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা যেন পৃথিবীর শৈত্য নয়, পৃথিবীর বাইরের কোনো আলৌকিক লোকের অস্বাভাবিক মৃত শৈত্য!

হঠাৎ শিশির বলল,- দেখুন, দেখুন অশনিদা, ঘরের ওই দিকটায় দেখুন।

দেখা গেল ঘরের কোণে হঠাৎ ঘোর ছাই রঙের একটা গোলার মতো বস্তু যেন শূন্য থেকে তৈরি হয়ে এসে ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে বস্তুটি ক্রমশঃ যেন আয়তনে বাড়তে লাগলো। এত দূর থেকেও মনে হচ্ছিল বস্তুটি যেন কুৎসিতের একটা মূর্ত প্রতীক। যা কিছু নোংরা যা কিছু কদর্য, সবই যেন আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে ওই গোল বলের মতো বস্তুটি ভিতরে ভিতরে। ঘরের মধ্যেকার সেই গন্ধ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত লাগছিল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায়। অথচ বস্তুটা দ্রুত গড়ে উঠতে উঠতে সরে যাচ্ছিল ঠিক নীচে নামবার একমাত্র দরজাটার কাছে।

দেয়ালের গা ঘেঁষে তিনজন দাঁড়িয়ে ছিল তিন টুকরো মাংসের

তালের মত। পরস্পরের শরীরের কাঁপুনি সঞ্চারিত হচ্ছিল পরস্পরের শরীরে। শিশির অপলকে তাকিয়েছিল সেই অবিশ্বাস্য গঠিত হয়ে উঠতে থাকা ভয়ঙ্কর অতিমানবিক বস্তুপুঞ্জের দিকে। অশনিনাথ আর সোমনাথেরও অবস্থা তাই-ই।

আস্তে আস্তে সমস্ত ঘরটা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। মারকারি বাল্বগুলির ভিতরে ভিতরে আলোর বিন্দুপ্রমাণ জ্যোতি ম্লান হয়ে ঘিরে রইল প্রায় না জ্বলারই মত। ক্রমশঃ সারা ঘর যেন একটা অন্য জগতে রূপান্তরিত হতে লাগলো। সে জগতের সঙ্গে যেন স্বাভাবিক মানুষের কোনো যোগই নেই।

সেই বস্তুপুঞ্জ তখন বৃহৎ বিশাল হয়ে দরজা কেন ডোমের অনেকখানি উচু পর্যন্ত গড়ে উঠে দরজার সমস্ত প্রস্থটাকে অধিকার করে ফেলেছে। এবং মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য একটা ছেনি, টুকরো টুকরো করে ছেনে গড়ে তুলছে একটি আকার। অন্ধকারে আকারটা ফিকে নীলচে একটা আভা বিকিরণ করছে। আভাটা সরোম আর গাঢ় ছাইরঙা অন্ধকার মেশানো।

ক্রমশঃ তৈরি হয়ে উঠলো বড় বড় ঠেলে বের হয়ে আসা দুটো চোখ। চোখের আবার রঙটা ঈষৎ নীলচে। তাতে কোনো দৃষ্টি নেই। স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো ফোলা ফোলা এবড়ো-খেবড়ো নাক। নাকের তলায় মাংসল দুটি ঠোঁট। সেই লোল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিতে লাগলো হলুদ হলুদ দাঁতের সারি।

ক্রমশঃ গড়ে উঠতে লাগলো হাত, হাতের ফোলা ফোলা বাঁকা বাঁকা অর্ধগলিত আঙুল। আঙুলের মুখে সুঁচলো নখ আর দীর্ঘ ন্যুজ হাঁটু। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই মূর্তিকে এবার চেনা যাচ্ছে।

শারমার সেই প্রভুভক্ত দ্বাররক্ষীটি। কিন্তু সে তো এত বড়, এত বিশাল, এত বীভৎস ছিল না।

অশনিনাথ বললেন,— ও কোনো জীবন্ত মানুষ নয়, পিশাচ,—ও পিশাচ···শারমা আজ রাতে একটা পিশাচকে জাগিয়ে তুলেছে। যাতে আমাদের ক'জনকে শেষ করে দেওয়া যায়।

শিশির বুঝতে পারলো তার শরীরের ভিতরটা বাঁশ পাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। সে দেখলো মূর্তিটা এবার শূন্যে দুলতে দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সেই ভয়ঙ্কর ভাবলেশহীন চোখের স্থির অক্ষিগোলকের তলায় সাদা সাদা দুটি শূন্যতা, আর সেই হলুদ ছত্রখান দাঁতের দু'পাশে লোল দুটি ঠোঁটের পুরু পুরু বিস্তার। সোমনাথের দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার শব্দ উঠছিল অন্ধকারে। সে নিজেকে সংবরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বলল,—অশনিদা, গুলি করুন গুলি।

অশনিনাথ ভয়ার্ত চাপাকণ্ঠে বললেন,—গুলি করলেও কোনো কাজ দেবে না···এখানে গুলির কোনো মূল্য নেই।

—বেশ, তাহলে আপনি রিভলবারটা আমাকে দিন।

শিশির বুঝতে পারলো, সোমনাথের হাতে অশনিনাথ তাঁর রিভলভারটি তুলে দিলেন।

অন্ধকারে প্রখর বিদ্যুৎচমক খেলে রিভলভার গর্জে উঠলো। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ক্রমাগত এগিয়েই আসতে লাগলো। মনে হলো ঘরের হাওয়ায় পাশবিকতার প্রগাঢ় ছায়া যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি উঁচু হয়ে ছাদের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায়।

অশনিনাথ চাপা গলায় শিবস্তোত্র আবৃত্তি করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো শব্দ যেন তাঁর মাথায় এলো না। এত পরিচিত, এত কণ্ঠস্থ সব দেবস্তোত্র, দেব দেবীর নাম হাওয়ায় হারিয়ে যেতে লাগলো। স্মৃতি থেকে মুছে যেতে লাগলো।

দুটো ভয়াল হাত তার বিশাল বিশাল করতল, তার স-নখর আঙুলগুলোর সুচোলো কালো কালো নখ যেন ভেসে উঠলো ওদের তিনজনের গুটিসুটি মারা, অন্ধকারে সিঁটিয়ে থাকা শরীরের ওপর। তখনই অন্ধকারে হঠাৎ ঝক্ ঝক্ করে উঠলো সোমনাথের গলার চেনে ঝোলানো ধাতব ওঁ-কারটি। সেদিকে শিশিরের মতো অশনিনাথেরও চোখ পড়ে গেল। তিনি হঠাৎ সোমনাথের গলা থেকে চেনটা টেনে নিয়ে বিড়

বিড় করে বলতে লাগলেন সেই স্তোত্রটি, সেই অসতো মা সদ্গময়ো তমসো মা জ্যোতির্গময়···সেই আলোক প্রার্থনার বাণী। তারপর ছুঁড়ে মারলেন ঝুঁকেপড়া সেই ছায়ার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগলো সেই ভয়ঙ্কর দীর্ঘ মূর্তির শরীর। হাওয়ায় মিশিয়ে যেতে লাগলো টুকরোগুলো। ক্রমশঃ গন্ধ কমতে লাগলো এবং আলোর বাল্বগুলির ভিতরে ফিরে আসতে লাগলো ঈষৎ জ্যোতি। আস্তে আস্তে জ্বলে উঠলো আলোকগুচ্ছ। ঘরের বাতাস হয়ে উঠলো হালকা স্বাভাবিক।

তিনজন ভয়ার্ত বুদ্ধিভ্রংশ মানুষ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে প্রায় একসঙ্গেই শক্তি সংগ্রহ করে, পাগলের মতো ছুটলো সিঁড়ির দিকে। সোজা নেমে গিয়ে ছুটে উঠে পড়লো গাড়িতে।

গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো অশনিনাথের বাড়ির দিকে।

অশনিনাথের বারান্দায় আধশোয়া অবস্থায় বসেছিল সোমনাথ আর শিশির। অত রাতেও শ্রীমন্ত উঠে গরম কফি বানিয়ে এনে দিয়েছে! উঠে বসে সেই কফিটুকু পান করার মতও যেন শক্তি নেই তাদের। অশনিনাথের চোখের তলায় গভীর কালো ছায়া। কফির পেয়ালায় ধীরে লম্বা চুমুক মেরে তিনি বললেন,—আঃ বাঁচলাম। বলো সোমনাথ, এবার তাহলে আমরা কি করব? শিশির তুমিও কিছু বুদ্ধি দাও।

কফির পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে শিশির বলল,—কিন্তু অশনিদা, আজ সন্ধ্যে থেকে যে সব ঘটনা ঘটলো এ সব ঘটনা তো আমার নাগালের বাইরে।

অশনিনাথ বললেন,—তাহলে তোমার মতো যুক্তিবাদী মানুষও স্বীকার করে নিচ্ছে তো অলৌকিকের অস্তিত্ব।

শিশির বলল,—স্বীকার না করে আর উপায় কোথায়? কিন্তু অশনিদা, আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে। যখন আপনি আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়েই ফেলেছেন, আমাকে আপনাদের সঙ্গে রাখুন। আমি এ ঘটনা শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই।

অশনিনাথ বললেন,—শিশির আসলে আমাদেরও লোকবলের দরকার। আর এ সব ঘটনা সবাইকে সবসময় বিশ্বাস করে বলাও সম্ভব হয় না। তুমি সোমনাথের বন্ধু, এই জন্যেই তোমাকে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিপদের ঝুঁকি …আজ জানলাম প্রচণ্ড। দ্যাখো শিশির, আমি আর সোমনাথ আগে ভেবেছিলাম কেবল ড্রাগ্ অ্যাডিকসন করে এই সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে শারমা। কিন্তু এখন দেখছি ড্রাগ্ অ্যাডিকসন আর খুন ছাড়াও সত্যি পিশাচতন্ত্রের ব্যাপারও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

শিশির বলল,—সব রকম ঝুঁকি নিতে আমি রাজী আছি অশনিদা। আর লোকবল? লোকবলের দরকার হলেও আমি আপনাকে অতি বিশ্বস্ত কর্মী দিয়ে সাহায্য করতে পারবো।

সোমনাথ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, আমার মাথা এখনো বনবন করে ঘুরছে অশনিদা। আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই এখন।

অশনিনাথ বললেন,—কিন্তু ঘুমোনোর সময় তো নেই সোমনাথ। সমস্ত ব্যাপারটা আমি যতটা আন্দাজ করছি তা তোমাদের বুঝিয়ে বলি একটু। দ্যাখো, আজ ভূত-চতুর্দশী। কাল বিকেল পর্যন্ত চতুর্দশী থাকবে। আজ শারমা কোনো রকম বিশেষ অনুষ্ঠান করছিল, যাতে করে শোভনকে পিশাচতন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়। কাল বিকাল থেকে অমাবস্যা পড়ছে। কাল বিকেলে হবে আসল দীক্ষার অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তন। কাল বিকেলের আগে যদি শোভনকে উদ্ধার করে না আনতে পারি, তাহলে শারমা শোভনকে শেষ করে দেবেই! শোভনকে আর আমরা ফেরাতে পারব না। তাই যে ভাবেই হোক শোভনকে খুঁজে বের করতেই হবে।

শিশির বলল,—কলকাতা পুলিসের অত্যন্ত দক্ষ অফিসার আছেন। এ ব্যাপারে আপনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন না কেন অশনিদা?

সোমনাথ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করতে গিয়ে হঠাৎ একটা উজ্জ্বল সোনালী বস্তু তুলে ধরল।

—আরে সেই সুন্দরী মেয়েটির পার্সটা যে আমার কাছেই থেকে গেছে।

অশনিনাথ তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সোমনাথের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন,—দেখি দেখি, এটার মধ্যে যদি কোনো হদিস পাওয়া যায়।

পার্সটা খুলতেই তার মধ্যে ঝকমক করে উঠল একটি মূল্যবান পাথর বসানো হার। একটি ছোট কার্ড। পিছনে এণ্টালির একটি ঠিকানা লেখা। কার্ডটি পার্ক স্ট্রীটের ফুলের দোকানের। আর একটি তাবিজ ও কিছু খুচরো টাকা।

অশনিনাথ বললেন,—যাদের কেউ নেই, সত্যিই তাদের ভগবান আছেন। যাও সোমনাথ তুমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল ভোরে আমি তোমায় উঠিয়ে, দেবে। তুমি এণ্টালির এই বাড়িতে গিয়ে এই মেয়েটির খোঁজ করবে। বলবে ব্যাগটা তুমি ওকে ফেরৎ দিতে এসেছো। কারণ এই তাবিজটা দেখেই আমি বুঝতে পারছি এই ব্যাগ হারিয়ে মেয়েটিরও এখন পাগলের অবস্থা। সে যে কোনো মূল্যে ব্যাগটি ফেরত চায়।

সোমনাথ বলল,—ঠিক আছে। তাই হবে।

অশনিনাথ বললেন,—যাও এবার একটু ঘুমিয়ে নাও তোমরা। কাল সকাল থেকে আবার ঘোরতর খাটুনির মধ্যে গিয়ে পড়বে।

সকালবেলার হালকা আলোয় শিশির ঘুম থেকে জেগে উঠতেই দেখল অশনিনাথ তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁর সদ্যফোটা গোলাপের একটি তোড়া।

শিশির ধড়মড় করে উঠে বসে পড়ে বলল,- ব্যাপার কি ?—তারপর পাশের বিছানায় তাকিয়ে দেখল সোমনাথ তখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। সোমনাথকে তুলে দিয়ে অশনিনাথ বললেন,—হাতমুখ ধোও। সুন্দর করে সাজো। আজ তোমাকে প্রেমিকের অভিনয় করতে হবে।

সোমনাথ থতমত খেয়ে বলল,—মানে ?

—হ্যাঁ। এই গোলাপের তোড়া আজ সকালবেলাই তোমার জন্যে বেছে বেছে বাগান থেকে তুলে এনেছি। এটি নিয়ে তুমি মেয়েটির

সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ব্যাগ ফেরত দেবে কিন্তু তাবিজটা দেবে না। বলবে সম্ভবতঃ আমার কাছে থেকে গেছে। চাপ দিয়ে শোভনের ঠিকানাটা যোগাড় করবে যাতে শোভনকে আমরা নিয়ে আসতে পারি অমাবস্যার পৈশাচিক অনুষ্ঠান ঘটার আগে।

সোমনাথ বলল,—অভিনয় যদি সফল না হয়?

—হতেই হবে। কারণ তোমার অভিনয়ের ওপর শোভনের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কোনোক্রমে যদি মেয়েটিকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসতে পারো! আর শিশির, তোমারও কাজ আছে। আমার সঙ্গে তোমায় শোভনদের কলকাতার বাড়ি যেতে হবে। সেখানে বোধহয় এখন ওর কাকাও নেই। বাড়ি আছে ম্যানজারবাবুর হেফাজতে। আমাদের পিশাচতন্ত্রের সেই পুরোনো পুথিগুলো উলটে-পালটে দেখতে হবে।

সোমনাথ উঠে বসলে,—আমি তাহলে দ্রুত চলে যাই। এই কার্ড লেখা ঠিকানায় আমি চলে যাবো। গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবো। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো কখন?

—সন্ধ্যের আগে। সূর্য যেন না ডোবে।

অশনিনাথ বলল,—চা খেয়ে যাও, শ্রীমন্ত সব রেডি করেছে।

চায়ের সরঞ্জাম আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে শ্রীমন্ত তখনই ঢুকলো। তার হাতে সকালের খবরের কাগজ।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অশনিনাথ কাগজ উলটাচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন,—এই যে, আমি জানতাম,—এই ঘটনাই ঘটবে। নাকতলা পেরিয়ে ধানক্ষেতের পাশে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটি স্থানীয় শ্মশানের ডোম। মৃতদেহটি এত তাড়াতাড়ি কি করে পাওয়া গেল কে জানে? কাল মাঝরাতের আগে তো দেহটা ফেলা হয় নি!

শিশির বলল,—কাগজের অফিসে ফোন করুন না।

অশনিনাথ বললেন,—ফোন করে আর কি হবে? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবেই খবরের কাগজে খবরটা পৌঁছে গেছে। লোকটাকে

শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছিল।

শিশির বলল—খুন ?

—হ্যাঁ একটা বিশ্বাস আছে যে চণ্ডাল ডোম বাগদি এই সব জাত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণরা যাদের ছোট জাত বলে এসেছে এতদিন, তাদের মৃতদেহ নিয়ে শবসাধনা করলে নাকি সহজে সফল হওয়া যায়।

সোমনাথ বলল,—একটা বাজে কুসংস্কারের জন্যে নিরপরাধ লোকটিকে প্রাণ দিতে হলো।

অশনিনাথ বললেন—এই তো কাগজে লিখেছে, এই দরিদ্র লোকটিকে যে কেন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হলো তা কেউ বুঝতেই পারছেন না।

শিশির বলল,—আচ্ছা অশনিদা, কাল যাকে সেই গম্বুজ ঘরে দেখলাম, তার দেহ পাওয়া যায় নি ?

অশনিনাথ বললেন,—সেই দেহ ? যে দেহ বহুদিন আগে মৃত ? সে তো কবে গলে বাতাসে মিশিয়ে গেছে ! শবসাধনা করে শারমা ওই দেহে পিশাচ জাগিয়েছিল। সে পিশাচ তো কাল শেষ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। হয়তো একবছর দুবছর. দশবছর ধরে ঐ পিশাচ কৃতদাস ওই গলিত দেহে বন্দী হয়েছিলো।

—যাক নষ্ট করার সময় নেই আর। আমি চললাম। সোমনাথ উঠে পড়ল।

শিশির বাড়িতে ফোন করে দিল। সে বাড়ি হয়ে অশনিনাথের সঙ্গে শোভনদের লাইব্রেরীতে যাবে।

সোমনাথ প্রথমেই গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের সেই ফুলের দোকানটিতে গেল। আসলে আজ যে কাজে সে যাচ্ছে সে কাজের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেবার দরকার ছিল তার। একটি অচেনা মেয়েকে নিষ্পাপ প্রেমের কথা বলে অভিনয় করার চেয়ে তার ওপর যদি একশোটা গুণ্ডার মহলা একা নেবার আদেশ দিতেন অশনিনাথ তাহলে বোধহয়

সে ব্যাপারটা তার পক্ষে আরও অনেক সহজ হত।

সোমনাথের দীর্ঘায়ত সুন্দর চেহারা, তার পোশাকের পারিপাট্য, মস্ত গাড়ি দেখে সমীহভরে উঠে এলেন স্বয়ং দোকানের মালিক। সোমনাথ ভাবলো গোলাপ তোড়ার সঙ্গে একগুচ্ছ গ্লাডিওলি পেয়ে গেলে মেয়েটি হয়তো আরও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। দোকানের একজম কর্মচারী যখন ফুলগুলি তোড়া বেঁধে দিচ্ছিল তখন সে দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করল। তার প্রেমের অভিনয়ের রিহার্সাল যেন এই ফুলের দোকান থেকেই শুরু হলো।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ বলল,—আচ্ছা সম্প্রতি একজনকে আপনি আপনার দোকানের কার্ড দিয়েছিলেন কী?

—অনেককেই তো দিয়েছিলাম!

—না, মানে একটি মেয়ে,—মানে আমি তার কথাতেই আপনার দোকানে এলাম!

—কে বলুন তো?

—খুব সুন্দরী, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স হবে,—মেয়েটির ধরুন··· মানে খুব নিষ্পাপ চেহারা। আর হাতে বোধহয় একটা সোনার তারের ছোট্ট হাত ব্যাগ্।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। হ্যাণ্ড ব্যাগটার জন্যে তো বটেই। নিষ্পাপ চেহারাটার জন্যেও বটে! বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে একজন বেশ বয়স্কা মহিলা ছিলেন। উনি একঝাড় রজনীগন্ধা কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বার বার করে বলছিলেন লাল ফুল কেনবার জন্যে। আমার ফুলগুলো ওঁর খুব পছন্দ হয়ে ছিলো বলে আমি ওঁকে আমার কার্ডটা দিয়েছিলাম। তাতে একটু হেসে বললেন—ঠিক আছে, যতদিন আপনাদের শহরে থাকবো, ততদিন নিশ্চয়ই ফুল কিনতে আসবো!···কিন্তু তারপর আর আসেন নি। তাহলে উনিই আপনাকে আমার দোকান দেখিয়ে দিয়েছেন? —ভালো।

সোমনাথ বলল—হ্যাঁ! ওঁর জন্যেই ওই ফুল নিয়ে যাচ্ছি। ফুলের

গুচ্ছটা বুকের কাছে ধরে সোমনাথ হঠাৎ বলল — আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয় মেয়েটি খুব নিষ্পাপ ?

দোকান মালিকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বোধহয় সোমনাথের অসহায় অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পারলেন। বললেন— সত্যিই, আমি আন্তরিকভাবে মনে করি তিনি খুব নিষ্পাপ।

সোমনাথ যখন ড্রাইভ করে চলল,—তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো মেয়েটির চেহারাটি তার অন্তঃস্থলে এত পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত হয়ে গেছে যে সে যেন ছবির মতো সেই মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। ছিপছিপে কোমল একটি শরীর। ফুটন্ত ফুলের মতো একটি মুখ। হাতে একটি পানপাত্র নিয়ে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এণ্টালির সেই বাড়িটির কাছে এসে গাড়িটা রাখলো সোমনাথ। মস্ত ব্যারাক বাড়ি ! গোটা কুড়িক ফ্ল্যাট আছে।

কার্ডে ফ্লাট নাম্বার দেওয়া ছিল। ফ্ল্যাট নাম্বার মিলিয়ে মিলিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সোমনাথ। দরজার সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে মিসেস এন. কে কাপুর।

সোমনাথের বুকের কাছে দু-গুচ্ছ টাট্‌কা ফুলের তোড়া। তবু সে ডোরবেল্ বাজাবার আগেই পকেটে হাত দিয়ে নিজের অটোমেটিক্-টাকে আন্দাজ করে নিল।

বেল বাজাতেই ম্যাজিক আই-এর স্বচ্ছ কাচটা ঈষৎ ঘোর হয়ে এলো। তারপর দরোজা খুলে গেলো।

দরোজার মুখে যেন দরোজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক বিশালদেহী মহিলা। এঁকে সেদিন রাত্রে শোভনদের সেই পার্টিতে দেখেছিল সোমনাথ। মনে পড়ল তার বিশাল চেহারা। কদর্য একটি মুখ। মুখের চামড়ায় অদ্ভুত সব কুঞ্চন। ঘোলাটে চোখে বয়স্কা মহিলার অনুচিত কামার্ত দৃষ্টি। সোমনাথ বলল,—মিসেস কাপুর আমাকে চিনতে পারছেন ?

মিসেস কাপুর বললেন,—আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

সোমনাথ বলল,—কেন মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছেন ?

মহিলা ঘুম ঘুম চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করে অনেক ভাববার যেষ্টা করলেন তারপর বললেন—কোনো বন্ধুর বাড়িতেই বোধহয়…

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল,—হ্যাঁ, বন্ধুই, বন্ধুই তো!

মহিলা ফুলের তোড়া দেখে এবার এগিয়ে এলেন। আসতেই ভক্ করে একটা গন্ধ পেল সোমনাথ। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মহিলা ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। তাই ঠিক ধরতে পারছে না, সোমনাথকে কেন্দ্র করে ঠিক কি ঘটেছিল। এইটুকুই তাঁর স্মৃতিতে আছে যে কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বন্ধু হিসেবেই সোমনাথকে দেখেছিলেন। সোমনাথ গোলাপের গুচ্ছটি পরম অনিচ্ছায় মিসেস কাপুরের হাতে তুলে দিয়ে বলল;—আপনার জন্যে এনেছি। আমার বাগানের ফুল। আর আর এই গ্ল্যাডিওলিটা—

—বুঝেছি বুঝেছি,—চন্দ্রার জন্যে তো?—দিন, আমাকে দিন। চন্দ্রা এখন খুব ব্যস্ত আছে। ও আজ কারো সঙ্গে দেখা করবে না। এবার সোমনাথ একটু নির্লজ্জ হবার চেষ্টা করল। বলল—বেশ তো চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করার কি দরকার। আপনি তো আছেন। একটু আপনার সঙ্গেই কথা বলি।

মিসেস কাপুর বোধহয় এবার একটু প্রসন্ন হলেন। দরোজাটা ছেড়ে দিয়ে বললেন,—আসুন আসুন ভিতরে আসুন! সোমনাথ তাঁর পিছন পিছন ভিতরে ঢুকলো। সরু প্যাসেজের উপর একই সারিতে তিনটি ঘর। কোণে রান্নাঘর। বাক্সের মতো একটি জায়গা। যে ঘরটিতে সোমনাথকে নিয়ে ঢুকলো মহিলাটি সে ঘরটি খুব সাদা-মাটাভাবে সাজানো। কোণে একটি টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানীতে শুকনো ফুলের গোছা। সেদিকে তাকিয়ে মিসেস কাপুর বললেন—আসলে ফ্ল্যাটে থাকবারই তো সময় পাচ্ছি না। তাই ফুলগুলোও বদলানো হয়নি। আপনি বসুন একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

সোমনাথ চুপচাপ বসে রইল। মোটা মোটা পর্দা টাঙানো ধূলোর গন্ধ ভরা ঘর। সারা ফ্ল্যাটে থমথমে একটা আবহাওয়া মানুষের কোনো সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় এখুনি যেন এই মুহূর্তে

কোনো একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে শারমার কোনো লোক। কিংবা কোনো অলৌকিক প্রচ্ছায়া। কিন্তু সেই মেয়েটিই বা কোথায়? সে কি সত্যিই এই ফ্ল্যাটে আছে? নাকি অন্য কোথাও থাকে সে। এ ফ্ল্যাটে কেবল এই পিশাচিনীর সঙ্গে সে একলা।

সোমনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো খানিকটা। তারপর উঁকি মেরে দেখলো রান্নাঘরে গ্যাস জ্বালিয়ে মিসেস কাপুর নিজেই চা বানাচ্ছেন।

হঠাৎ পাশের ঘরের পর্দা দুলে উঠলো। সেই পর্দার পাশ দিয়ে দেখা গেল চন্দ্রাকে। সে সোমনাথকে দেখতে পায়নি। মিসেস কাপুরের দিকে তাকিয়ে বলল,—আন্টি, আমি চা খেতে পারি তো?

সোমনাথ দ্রুত এসে বাইরের ঘরের চেয়ারে যেমন বসেছিল তেমনি বসে পড়লো। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো চন্দ্রা তারপর চমকে চুপ করে দাঁড়ালো। সে সোমনাথকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো।

সোমনাথ তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললো,—আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—আমাকে? কেন? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

—আমাকে আপনি আগে দেখেন নি?

—চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ খুব রহস্য করে বলল,—হয়ত পূর্বজন্মে! যাক্ দয়া করে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

—আমার সঙ্গে আপনার আবার কিসের দরকার থাকতে পারে?

—একজন বন্ধুর, একজন বন্ধুর সঙ্গে কিসের দরকার থাকতে পারে বলুন?

—আপনি আমার বন্ধু?

হাসল চন্দ্রা। ম্লান চন্দ্রকিরণের মতো একটি হাসি। মনে হয় যেন এই জগতে কারো কাছ থেকেই তার যেন কোনো কিছুই চাইবার নেই।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝবেন,—আমি আপনার কত বন্ধু!

—কিসে বুঝবো ?

হঠাৎ সোমনাথ যেন জাদুকরের ভঙ্গীতে নিজের বুক্‌পকেট থেকে সেই ব্যাগ বের করল।

আনন্দে উল্লাসে অধীর হয়ে হাত বাড়ালো চন্দ্রা।

-- আপনি ওটা এনেছেন ? ফিরিয়ে এনেছেন তাহলে ? বাঁচলাম আমি। হ্যাঁ এবার মেনে নিচ্ছি। আপনি সত্যিই আমার বন্ধু।

ইতিমধ্যে ট্রে-তে করে চা আর বিস্কিট্‌ নিয়ে ঢুকলেন মিসেস কাপুর। সোমনাথ তাবিজটি পকেটে পুরে রাখল। চন্দ্রাকে দেখেই গন্‌গুনে মুখে বললেন,—এ-কি তুমি এখানে বেরিয়ে এসেছো কেন চন্দ্রা ?

চন্দ্রা উল্লসিতকণ্ঠে বলল,—আন্টি এই দেখুন আমি আমার ব্যাগটা ফিরে পেয়েছি। শারমা এঁকে দিয়ে আমার কাছে ব্যাগট পাঠিয়ে দিয়েছেন !

মিসেস কাপুর এবার যেন অন্যদৃষ্টিতে তাকালেন সোমনাথের দিকে।

ও – ও আপনি আগে বললেই পারতেন যে আপনি শারমার কাছ থেকে এসেছেন ! তাহলে আর,—

সোমনাথ বুঝতে পারল ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। সে বলল,—আপনারা আর বলবার সময় দিলেন কই ? যাই হোক আমি বলছিলাম আজ সন্ধ্যায় আপনারা কি করছেন ?

—কেন আজ সন্ধ্যায় তো আমাদের শারমার সঙ্গে যাওয়ার কথা। আপনি যাচ্ছেন না ?

সোমনাথ কথার উত্তর দেওয়ার আগেই চন্দ্রা বলল,—না শারমা বলেছিলেন তাবিজটা না পাওয়া গেলে আজ সন্ধ্যায় আবার নতুন করে তাবিজ করাতে হবে—তারপর···

সোমনাথ বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আজ সন্ধ্যার ব্যাপারটা ঠিকই আছে মিসেস কাপুর। আপনারা ওখানেই যাবেন। আমারই বলতে ভুল হয়ে গেল। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম আজ দুপুরে আপনারা কোথায় যাবেন ?—যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেণ্ট না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে বেরোতে পারেন !

মিসেস কাপুর অবাক হয়ে বললেন—আমি না হয় বেরোতে পারি। এ্যাকচুয়ালি আমার তো আর কোথাও যাবার বাধা নেই। কিন্তু চন্দ্রা কি করে যাবে? চন্দ্রার পক্ষে তো আজ কোথাও যাওয়া সম্ভব না। এ কথা আপনি আমাদের লোক হয়ে কি করে বলছেন? কিন্তু আপনি বলছিলেন না বাইরে যাবেন! চলুন, এবার আপনার সঙ্গে আমি বেরোতে পারি। আমার কিছু জিনিসপত্র সওদা করতে হবে। একটু অর্থপূর্ণভাবে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজকের রাতের উপকরণ সব, বুঝলেন তো। বাজার ঘুরলেও মেলে না।

সোমনাথের সমস্ত উৎসাহ কে যেন জল ঢেলে নিভিয়ে দিল। সে ক্ষীণগলায় বলল,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলুন কোথায় যাবেন?

মিসেস কাপুর বললেন—আপনি একটু বসুন, আমি তৈরী হয়ে নিই।

মিসেস কাপুর অন্য ঘরে চলে যেতেই সোমনাথ অসহায়ভাবে চন্দ্রার দিকে তাকালো। তাকাতেই তার মনে হলো চন্দ্রার চোখ দুটি সজল একটা আকুতিতে টলটল করছে। চোখের মধ্যে যেন কিসের একটা প্রশ্ন এবং কিসের একটা গভীর প্রার্থনা।

সোমনাথ হঠাৎ চাপাগলায় বলল,—আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।

চন্দ্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, কি বলবেন বলুন!

সোমনাথ কথাটা বলেছিল তার অন্তঃস্থলের একটা আবেদন থেকে। কিন্তু কেন বলেছিল তা তার নিজেরই মনের সচেতনে ছিল না। সোমনাথ তাই থতমত খেয়ে বলল,—ফুলগুলি আপনার কেমন লাগলো?

চন্দ্রা বলল,—আমার সবচেয়ে ভালো লাগে গ্ল্যাডিওলি আপনি কি করে জানলেন?

সোমনাথ হেসে বলল, জানেন না, আমি হাত গুণতে জানি?

হঠাৎ চন্দ্রার সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর তাতে ছড়িয়ে পড়লো আবির। রুদ্ধকণ্ঠে বলল,—দেখুন তো আমার হাতটা। আপনি সত্যিই কেমন হাত গুণতে পারেন আমি তার প্রমাণ পেতে চাই।

সোমনাথের করতলে নিজের করতলটি জোর করে মেলে দিল চন্দ্রা। সোমনাথ তার হাতটা দেখতে যাবে এমন সময় করিডোরে মিসেস কাপুরের শাড়ির খস্‌খস্‌ শব্দ উঠতে লাগল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চন্দ্রার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল,- আমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেন তো ?

চন্দ্রা বলে ফেললো—হ্যাঁ।

—তাহলে বলি আপনাকে, মিসেস কাপুরকে বাজারে পৌঁছে দিয়ে আমি এখনি আবার ফিরে আসছি। আসলে আপনার তাবিজটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। ওটা আমি এখন আনি নি। কেবল ব্যাগটাই এনেছি।

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়লেন মিসেস কাপুর। হেসে বললেন— চলুন মিঃ—কি বলবো। আপনার নাম তো আমি ঠিক জানি না !

সোমনাথ হেসে বলল,—সোমনাথ চ্যাটার্জি !

—আচ্ছা আচ্ছা ! চলুন তাহলে !

সোমনাথ বলল আচ্ছা চন্দ্রাদেবী তাহলে যাই !

মিসেস কাপুরকে বড়বাজারে নামিয়ে দিয়ে সোমনাথ যখন আবার এণ্টালির ফ্ল্যাটে ফিরে এলো তখন চন্দ্রা তার ফ্ল্যাটে একা। সে ইতিমধ্যে স্নান সেরেছে। ভিজে চুলগুলি ঘন-কালো। চক্‌চক্‌ করছে। মাথার চুলের স্তূপে একটি জবার মালা জড়ানো। পরনে একটি খড়খড়ে খয়েরী ধাঁচের কাপড়ের ম্যাক্সি। সেটা দেখেই সোমনাথের গা শির্‌শির্‌ করে উঠল। কারণ সে বুঝতে পারল এটা রক্তে ভেজানো। ঘরের এককোণে একটি ফ্লাওয়ার ভাসে সে সযত্নে গ্ল্যাডিওলিগুলো সাজিয়েছে। সব মিলিয়ে চন্দ্রাকে দেখলে মনে হয় যেন সে নিজেকে একটা উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করছে।

সোমনাথের মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল শোভনের স্মৃতি। না জানি শোভনকে নিয়ে কি করছে শারমা। তাকেও কি এমনি কোনো পিশাচিক উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে ওরা। কে জানে ? এক-

সময় সোমনাথ, সবাই যেমন কিছুটা কৌতূহলে এবং কিছুটা খেলার ছলে করে, তেমনিভাবে কিরোর বই-টই ওলটাতো। আজ যে সেই ফাঁকি দেওয়া বিদ্যে কিছুটা কাজে লেগে যাচ্ছে তাতেই সে মহাখুশি। চন্দ্রা সোমনাথের মুখোমুখি বসে সাগ্রহে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—দেখুন, দেখুন তো এ কি স্বাভাবিক হাত?

সোমনাথ বলল—হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

চন্দ্রা বলল—আপনি দেখুন না! আমি সাধে শারমার কাছে আসিনি। আপনি দেখুন না আমার লাইফ-লাইনটা!

সোমনাথ চন্দ্রার কোমল সুছাদ করতলটি দুহাতের মধ্যে ধরে ভালো করে দেখতে দেখতে সত্যিই তার বিস্ময় চাপতে পারল না। মাত্র একটুখানি এগিয়েই হঠাৎ ওর সমস্ত জীবনরেখাটাই ফুরিয়ে গেছে। তারপর অনেকটা শূন্যতা। তারপর আবার জীবনরেখাটা ফিরে এসে চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। এই অদ্ভুত ছেদ কেন? এ তো অবধারিত মৃত্যুচিহ্ন। একখানি ফাঁক—এ তো থাকার কথা নয়।

চন্দ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই চোখ তুলল সোমনাথ। চন্দ্রা হেসে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, আপনার চোখেও তাহলে ব্যাপারটা ধরা পড়েছে? জানেন আমি জানি একুশ বছর তিন দিন আমার পরমায়ু। আমার বয়স কাল একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। একুশ বছর একদিন আমার বয়স। আপনিই বলুন এখনও যদি না আমি পাগল উন্মাদ হয়ে উঠি তাহলে আর কবে হবো?

সোমনাথ চন্দ্রার মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো।

চন্দ্রার চোখ দুটি ছলছলে। মুখের রেখায় রেখায় একটা অপূর্ব পবিত্রতা। কিন্তু সত্যিই যদি চন্দ্রার পরমায়ু আর মাত্র দুদিন হয় তাহলে···

সোমনাথ হেসে উঠলো এবার।

—সত্যি, সত্যি আপনি এই সব হোকাস-পোকাসে বিশ্বাস করেন?

চন্দ্রা ফ্যাকাশে মুখে বলল,—আমি শারমাকে বিশ্বাস করি। উনি যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

অর্থাৎ শারমা আপনাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কাতর করে রেখেছে ?

—না মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কাতর করে রাখলে আমি শারমার কথা মেনে নিতাম না সোমনাথবাবু। তিনি আমায় পথ দেখিয়েছেন। বাঁচার পথ—

—বাঁচার পথ ?

--হ্যাঁ, আপনি এমন একটা ভান করছেন যেন কিচ্ছু জানেন না।

সোমনাথ বুঝতে পারল গভীর দুশ্চিন্তায় তার অভিনয়ে ভুল হতে শুরু করেছে। তার সবই জানা উচিত ছিল।

সে তবু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। সে বুঝতে পারছিল এই পরমায়ু সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেই শারমার কাছে হয়তো আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছে চন্দ্রা। আর সেই জন্যেই সারাদিন ধরে সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে। জবার মালায় উপবাসে রক্তে ভেজা পোশাক পরে। তাই বললো—

—না সে কথা বলছি না বলছি, যে এত দুরূহ সব ব্রত পালন-টালন আপনাকে করতে হবে, আপনার তাতে কত কষ্ট হবে বলুন, আমি সেই কথাই বলছিলাম।

চন্দ্রা বলল কষ্ট ? কষ্ট কি বলছেন অনন্ত জীবনের জন্য অনন্ত-কালের জন্য ভগবানের জগৎ থেকে শয়তানের জগতে চলে যাচ্ছি। এ জন্যে মনস্থির করতে আমার কম সময় লাগেনি। তিন মাস ধরে ক্রমাগত ভেবেছি, আর ভেবেছি। আমি ভেবেছি শোভনবাবু ভেবেছেন আরো যাদের শারমা আশ্রয় দেবেন তাঁরাও ভেবেছেন।

সোমনাথ খুব গম্ভীর সবজান্তার ভঙ্গী করে বললো—সত্যিই তো। ভাববারই তো কথা। আমিও ভাবছি! আমিও যে শেষ পর্যন্ত কি করবো···

—শারমার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিন, আর কি করবেন ? কিই-বা করার আছে ?

—আচ্ছা শোভনেরও তো এই একই ব্যাপার, তাই না?

—হ্যাঁ, ওঁদের পরিবারে তো মৃগী রোগ আছে। তাই মৃগীর পূর্ণ

লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আজকাল যখন-তখন অজ্ঞান হয়ে যান। বংশে তো বাতি দেবার মতো কেউ রইল না। তাই শারমা বলেছেন যদিও শোভনবাবু সন্তানের মুখ হয়তো দেখতে পাবেন না, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের পরমায়ু অনন্ত করে নেবেন।

সোমনাথের ভিতর একটা অজানা ভয় থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনন্ত কালের জন্যে ভগবানের রাজত্ব ছেড়ে শয়তানের রাজত্বে প্রবেশ? সে কি ভীষণ জীবন্ত নরক। এই নরক থেকে এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে কি কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না? কিংবা শোভনকে বের করে আনা যায় না?

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। সে বললো,—চলুন আজ শারমার ওখানে যাবার আগে আমি কালীঘাটের কাছ থেকে আপনাকে টাটকা কিছু জবা এনে দিই।

চন্দ্রা বললো,—না না, ফুল লাগবে না। ফুল নিয়ে কি হবে! শারমা কালীঘাটের ফুল তো আরোই নেবেন না।

সোমনাথ তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠেছে চন্দ্রাকে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সে বলল,—না, আপনাকে নিয়ে আজ আমি একটু বেরোবই, আমার একটা কথা আপনি দয়া করে রাখুন!

চন্দ্রা একটু অবাক্ হয়ে বলল—কি কথা? বলুন?

—আমার একজন অত্যন্ত পরিচিত লোক আছেন। তিনি খুব ভালো কর-কোষ্ঠী বিচার করেন। আপনি তাঁকে একবার আপনার হাতটা দেখান। তাহলে হয়তো তিনি হাতের রেখার অন্য কোনো অর্থ বলে দেবেন।

চন্দ্রা হাসল। অদ্ভুত হতাশ আর করুণ একটা হাসি।

—আর মাত্র দুদিন পরমায়ু আমার। এখন আর আমার নতুন কোনো ঝুঁকি নেবার সময় নেই। তাছাড়া আমি কম লোককে হাত দেখাই নি সোমনাথবাবু। আমার পরমায়ুর অভাব থাকতে পারে। কিন্তু টাকার অভাব নেই।

সোমনাথ হঠাৎ তীব্র আবেগের বশবর্তী হয়ে চন্দ্রার দুটো হাত নিজের অঞ্জলিতে তুলে নিল। তারপর বললো,—একটি অনুরোধ রাখুন আমার। আমায় দয়া করুন। আমি আপনাকে ভালোবাসি!

চন্দ্রা আস্তে আস্তে নিজের হাতটা সোমনাথের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—কি—কি বলছেন আপনি?

সোমনাথ হাঁটুগেড়ে বসে চন্দ্রার কোলের ওপর ভেঙে পড়লো।

চন্দ্রা আস্তে আস্তে সোমনাথের মাথাটি তুলে দিতে দিতে বললো—বেশ, চলুন। দেখুন এখন ঘড়িতে তিনটে বাজে। আমায় কিন্তু সন্ধ্যে পাঁচটায় সময় এই ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিতে হবে। নাহলে আমার মৃত্যু আর কিছুতেই রোধ করতে পারবেন না আপনি। মনে রাখবেন আমার জীবন নিয়ে কিন্তু আপনি ছিনিমিনি খেলছেন!

সোমনাথ উঠে পড়ল। উৎফুল্লমুখে বলল, চলুন! এই পোশাকেই চলুন। আমার বন্ধু কিছু মনে করবেন না। তাঁর কাছেই আপনার তাবিজটা আছে।

চন্দ্রা বলল--বেশ, আমি তাহলে পাশের ঘর থেকে আমার হাত ব্যাগটা নিয়ে আসি। মনে রাখবেন ডায়মণ্ডহারবারের কাছে, হীরাপুর গ্রামের শৈবাল কুটিরে আমাকে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে পৌছোতে হবেই।

চন্দ্রা পাশের ঘরে চলে গেলে সোমনাথ তীব্র একটা লাফ দিয়ে উঠে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে শোভনদের বাড়িতে ফোন করলো! সৌভাগ্যবশতঃ একবারেই লাইন পাওয়া গেল। এবং এক্সটেনসন ধরে লাইব্রেরীতে লাইন নিয়ে পেয়ে গেল অশনিনাথকে। চাপা গলায় বলল, আজ সন্ধ্যে সাতটায় হীরাপুর গ্রামের শৈবাল কুটিরে শারমা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে ঐ চন্দ্রা নামের মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাই। আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসুন।

ওদিক থেকে অশনিনাথ বললেন, যেমন করে পারো মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। কিছুতেই ছেড়ো না। শোভনকে বাঁচানো চাই ই!

চন্দ্রার পায়ের শব্দ পেয়ে সোমনাথ তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিলো।

চন্দ্রা বলল, কাকে ফোন করছিলেন ?

সোমনাথ বলল—দেখছিলাম আমার সেই বন্ধুটি বাড়িতে আছে কিনা ? কারণ হাতে তো আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই একদম।

অশনিনাথের বাইরের ঘরটিতে বসে চন্দ্রা, মুগ্ধ হয়ে পুরোনো আমলের জিনিসপত্রগুলো দেখছিল। সোমনাথ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বড় বড় ড্রাগন এনগ্রেভ করা চায়না ভাস, ভারী পর্দা, পুরু সোনালী ফ্রেম দেওয়া তেলরঙা ছবি, বড় বড় আয়না ঝাড় লণ্ঠন এইসব দেখছিলো। স্বপ্নাশ্রিতের মতো চন্দ্রা বলল—জানেন, এই বাড়িটা দেখে আমার নিজের ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ছে। আমি যেন ছোটবেলায় এমনি ধরনের কোনো বাড়িতে ছিলাম। কিন্তু সে বাড়ি এখানে নয়। অনেক দূরে। সেখানে বন আছে। পাহাড় আছে। বালিয়াড়ি আছে।

আমার যদ্দূর মনে পড়ে আমার মায়ের খুব অসুখ ছিল ! তিনি সব সময় বিছানায় পড়ে থাকতেন। আর আমি আমার আয়ার হাত ধরে ধরে একটা বিরাট বাড়িতে একা একা ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের মস্ত বড় বাগান ছিল। বাগান না বলে মাইলের-পর-মাইল জোড়া বিরাট জায়গায় অজস্র গাছপালার ছোটোখাটো একটা জঙ্গলই বলা যায়। আমাদের ওই বিরাট বাড়িতে আমার মায়ের ওই একলা শুয়ে-থাকা আর অন্যমহল থেকে সামান্য দু-একজন আত্মীয়স্বজনের মাকে দেখে যাওয়া—এইসব দেখতে দেখতে আমার মাথা ঝিমঝিম করত। আমার হাত ধরে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি যেন দেখতে পেতাম একটা অদ্ভুত চেহারায় লোক আমাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে ! চোখাচোখি হতেই হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যেত। আয়া আমাকে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু সে অত নির্জন বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারতো না। ছট্‌ফট্ করতো। বলতো আমি এবার ঠিক চলে যাব। তোর বাবা গেছে, তোর মামারা গেছে—কেউ থাকতে পারেনি। এ বাড়িতে যে থাকবে সে-ই মরবে। তোর মা, অমন ফুলের মতো মানুষটা ! দেখিস বেশী দিন আর বাঁচবে না।

ঠিক চলে যাবে।

সেই সময় একদিন আমাদের ম্যানেজারবাবু একজন জ্যোতিষী নিয়ে এসেছিলেন। যদ্দূর মনে পড়ে সে মায়ের হাত দেখে আমার হাত দেখে বলেছিল আমাদের নাকি অনেক পরমায়ু। কিন্তু জানেন মা-কে শেখানো কথা বলা হয়েছিল। কিচ্ছু সত্যি না। লোকটা চলে যাবার পর আয়া আমাকে বলেছিল। তারপর কি হলো জানেন, সেই অদ্ভুত চেহারার লোকটা, যাকে আমি মাঝেমাঝেই লতাপাতার আড়ালে দেখতে পেতাম—সবার নজর এড়িয়ে আমাদের বাড়ির ওপর তলায় একদম মায়ের ঘরের কাছে চলে এলো। আমি কি একটা কাজে যেন মায়ের ঘরে গিয়ে পড়েছিলাম তখনই। দেখলাম লোকটা মায়ের বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে নির্নিমেষ চোখে মাকে দেখছে। মা তার কাছে নিজের হাতটি মেলে ধরেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন সোমনাথবাবু লোকটি দেখতে ঠিক শারমার মতো। শারমার এখন যা বয়স ঠিক সেই বয়স। তবে পোশাক অন্যরকম। একটা আলখাল্লার মতো জিনিস পরা। খুতনি থেকে ঝুলছে কতগুলো আলগা সাদা দাড়ি। লোকটা মাকে বলছিলো—তুমি মরে যাবে ঠিক মরে যাবে। তাই বলছি তোমার আত্মাটা দিয়ে দাও। তাহলে আমি তোমার অনেক বছর পরমায়ু দিয়ে দেবো।

আমাকে লোকটা প্রথমে দেখতে পায়নি। পিছন ফিরে ছিল। মা যেই বললেন—তুমি এখানে কেন? তুমি চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে—

মায়ের কথা শুনেই শারমার মতো দেখতে লোকটা ফিরে তাকালো। ওঃ, সে কী অদ্ভুত চোখ লোকটার। যেন আমার সমস্ত ভিতরটা ধরে টান দিচ্ছিলো। লোকটা আমাকে ডাকতে লাগলো। এসো, এসো খুকি এদিকে এসো, এই যে, দ্যাখো সুরমা, তোমার মেয়ের পরমায়ু দ্যাখো। তোমার ভগবানের রাজত্বের বিচারে মাত্র একুশ বছর! বেশ অন্ততঃ ওর মুখ চেয়ে, ওর আত্মাটা অ্যাকে দিয়ে দাও! তুমি কি চাও তোমার মেয়ে অকালে এইভাবে মারা যাক?

আমার মা কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যাও, যাও, শনিগ্রহ, যাও—হ্যাঁ, আমার মেয়ের শয়তানের জীবন পাওয়ার চেয়ে মরা অনেক ভালো। অনেক ভালো। জানেন সেইদিন রাতেই আমার মা মারা যান। তারপর আমার কাকারা আমাকে নিয়ে গেলেন লক্ষ্ণৌ-এ। সেখানেই আমার জীবনের আঠারোটা বছর কাটে। আবার ফিরে এলাম আমার বিষয়আশয় বুঝে নেবার জন্য। তারপরই শারমা নিজে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দেখুন আমি কিন্তু রাজী হয়েছি। বাঁচার লোভ আমার প্রচণ্ড। এ লোভ আমি ছাড়তে পারব না সোমনাথবাবু।

সোমনাথ অবাক হয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রার জীবনের দীর্ঘ কাহিনী শুনছিল। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোন ধরল। ফোনের ওপাশে অশনিনাথ কথা বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা। অশনিনাথ বললেন—সোমনাথ, এইমাত্র শিশির একটা পুরোনো পুঁথি খুঁজে পেয়েছে। মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা পুঁথিটা। পুঁথিটায় অদ্ভুত সব ব্যাপার পাচ্ছি। পুঁথিটা শোভনদের পুরোহিত বংশের কোনো পূর্ব পুরুষের। কিন্তু এর ভিতর সারমা বলে একজন টীকাকারের নামও পাচ্ছি। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে সেই টীকাকার শারমা আর এই শারমার মধ্যে একটা যোগসাজস রয়েছে! এতে লেখা আছে কি করে মানুষের আত্মা শয়তানকে উৎসর্গ করতে হয়। খুব জটিল সব ক্রিয়াপ্রক্রিয়া। আমরা তার প্রতিষেধক কি ভাবে নেওয়া যায় সেটাও লক্ষ্য রাখছি। সেজন্যেই কিছুটা দেরী হবে। তুমি কোনোক্রমে মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখো।

সোমনাথ ফোনটা নামিয়ে রেখে ফিরে এলো।

চন্দ্রা ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—কৈ, কি হলো?—আপনার বন্ধু আসছেন না? আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না সোমনাথবাবু!

সোমনাথ বলল—কেন ? কিছু দেরি হয়নি, এই তো দেখুন না ঘড়িতে মাত্র—

—মাত্র সাড়ে-চারটে। আপনি ঠিক পাঁচটার মধ্যে আমাকে মিসেস কাপুরের ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন তো ? কখনো পারবেন না সোমনাথবাবু। তা হয় না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন। আমি এবার চলে যাই ! আমি না হয় একটা ট্যাক্সিই ডেকে নিচ্ছি, আপনি কেবল আমার তাবিজটা ফিরিয়ে দিন।

সোমনাথ বলল, না না, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা এখন তো সাড়ে-চারটে আর আধঘণ্টা সময় আমায় দয়া করে দিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি রকেট স্পীডে এণ্টালিতে পৌঁছে দেবো। ঠিক পৌঁছে দেবো। চলুন আপনাকে এখন একটু বাগানে নিয়ে যাই। অশনিনাথের বাগানটা দেখবার মতো ! আর বাগানের শেষে গঙ্গার ঘাট। ওঁদের নিজস্ব ঘাট। ঘাটে ছোট বোট থাকে। বোটে একটু ঘুরিয়েও আনা যাবে আপনাকে···বেশি দেরি লাগবে না। ভয় পাবেন না। যদিও আপনার পরমায়ু সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা তা আমি বিশ্বাস করি না। তবুও আপনার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ আমার হাতেই।

চন্দ্রা কেমন যেন সন্দিগ্ধচোখে সোমনাথের দিকে তাকাল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—ঠিক আছে,—চলুন !

সোমনাথ আর চন্দ্রা বাগানে নেমে যেতেই সোমনাথ শ্রীমন্তর সঙ্গে কথা বলার ছুতো করে একটু পেছিয়ে গিয়ে নিজের হাতঘড়িটা আধঘণ্টা পিছিয়ে নিল।

এই অন্যায়টা করার জন্য একটা গ্লানি তাকে স্পর্শ করছিলো। কিন্তু শোভনকে তো শারমার কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। তা ছাড়া অশনিনাথ এই সরল সহজ নিষ্পাপ মেয়েটির মধ্যেও তো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেন। শারমার সর্বনাশা কবল থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়ই হলো তাকে বোঝানো যে শারমার পথ অনন্ত জীবনের পথ নয়। পৈশাচিক মৃত্যুর পথ। স্বাভাবিক মৃত্যুর পর যদি একটা

দেহ বেঁচে থাকে তাহলে সে দেহের বাঁচার উপকরণ অন্য দেহনিঃসৃত জীবন! রক্ত। মেদ মজ্জা।

বাগানের সবুজ ঘাসের আস্তর পেরিয়ে সোমনাথ সোজা এগিয়ে গেল বাগানের শেষ প্রান্তে রঙীন ছাতার তলায়। সেখানে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনা হয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রা।

শ্রীমন্ত ট্রে করে গরম ক্রিম আর ফেনায় ভরা দুগ্লাস এসপ্রেসো কফি এনে নামিয়ে দিল।

চন্দ্রা একবার বিরস চোখে কফির দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গার দিকে।

শ্রীমন্ত ফিরে এসে বলল,—আপনাকে ফোনে ডাকছেন। সোমনাথ মিয়োনো গলায় চন্দ্রাকে বলল,—কফিটা খান আমি এক্ষুনি আসছি……

অশনিনাথই ফোন করছিলেন। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন,—আজ যে জায়গায় ওদের মিট্ করার কথা সে জায়গাটা কোথায় যেন সোমনাথ?

—ডায়মণ্ডহারবারের কাছে। হীরাপুরের শৈবালকুটিরে।

—শোনো সোমনাথ আমাকে আর শিশিরকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে। আমরা যদি তেমন দেরি দেখি তাহলে হয়তো সোজা ডায়মণ্ডহারবারেই চলে যেতে পারি। তুমি কিন্তু মেয়েটিকে যেভাবে হোক আটকে রেখো। এমনও তো হতে পারে, যে শারমা মেয়েটিকে না পেলে আজকের পৈশাচিক ক্রিয়াকর্মটা বন্ধ করেও দিতে পারে—

সোমনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—কিন্তু একটি মেয়ে, যার মাত্র দুদিন পরমায়ু বাকি আছে, তাকে কি আটকে রাখাটা ঠিক হবে?

অশনিনাথ বলেন—যার সত্যিই মাত্র দুদিন পরমায়ু তার জন্যে মনের জোর তৈরী করা ছাড়া আমি তো আর কোনো উপায়ই দেখি না।

—কিন্তু শারমা যে তাকে অনন্ত জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—

ওদিক থেকে অশনিনাথ চরম বিরক্তিতে বলে উঠলেন—আঃ

সোমনাথ, তুমি খামোখা উত্তেজিত হয়ে পড়ছো, দুর্বল হয়ে পড়ছো! তোমার কি খুব ভালো লাগবে যদি ওই সুন্দর পবিত্র মেয়েটি একটা রক্তপিপাসু কামার্ত পিশাচিনী হয়ে যায়?

সোমনাথ বলল,—কিন্তু আমি যে চন্দ্রাদেবীকে কথা দিয়েছি যে পাঁচটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবই···

অশনিনাথ বললেন—যাক্ তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলারও এখন সময় নেই আমার, তুমি যা ভালো বোঝো করো।

টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ হলো।

অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। গঙ্গার জল রঙীন হয়ে উঠছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা গাঢ় বিষাদ একটা গভীর শান্তি। সোমনাথ দেখল দূরে রঙীন ছাতার তলায় গা এলিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে চন্দ্রা। চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ায়, করুণায় সোমনাথের সারা মন যেন কেঁদে উঠলো। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলো চন্দ্রার কাছে। বলল,—চলুন, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে!

চন্দ্রা গ্রীবা তুলে বলল,—কটা বেজেছে?

সোমনাথ বলল, আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ঘড়ির সময় আধ ঘণ্টা পিছিয়ে রেখেছিলাম। এখন মিসেস কাপুরের কাছে এণ্টালিতে যাওয়ার সময় নেই আর। আপনাকে আমি সিধে নিয়ে যেতে চাই হীরাপুরের শৈবালকুটিরে?

চন্দ্রা চোখ বড় বড় করে তাকালো।

—কি বলছেন আপনি সোমনাথবাবু, আপনি আমার এতখানি বিপদ জেনেশুনেও আমাকে ইচ্ছে করে মিথ্যে, কথা বলছিলেন। কিন্তু কেন?

সোমনাথ বলল,—আপনি বিশ্বাস করুন, এখন পর্যন্ত আমি আপনার জন্য যা-যা করেছি সবই আপনার ভালোর জন্যেই কিন্তু এখন সত্যিই যখন উপায় নেই তখন কি আর বলব বলুন, আপনাকে নিয়ে গিয়ে তুলে দিতে চাই আমার বন্ধুর হাতে!

চন্দ্রা এবারে সবেগে উঠে দাঁড়াল।

—আপনার বন্ধুর হাতে!—অনেক হয়েছে সোমনাথবাবু। আপনি

আমার প্রচুর উপকার করেছেন। আর দয়া করে উপকার করতে হবে না আমার। আমাকে আপনি সোজা শারমার কাছে পৌঁছে দিন।··· তাছাড়া আপনাকে আর বিশ্বাস কি বলুন? নিজেই চলে যেতে চাই শারমার কাছে ···আপনি যে কৌশল করে আমার তাবিজটা নিয়ে নিলেন এটাই আক্ষেপ রইল।

চন্দ্র দ্রুতবেগে এগোতে লাগল। সোমনাথ তার পিছন পিছন যেতে যেতে বলল,—চন্দ্রা দেবী! চন্দ্রা দেবী! আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক আপনাকে শৈবালকুটিরে পৌঁছে দেব। দয়া করে এ বিশ্বাসটুকু আমার ওপর রাখুন!

চন্দ্রাকে নিয়ে নিজের স্পোর্টসকারে উঠল সোমনাথ। গাড়িটা উড়ে চলল রাস্তা দিয়ে।

অশনিনাথ আর শিশির পাশাপাশি বসে। গাড়ি ছুটছে ডায়মণ্ড-হারবার রোড ধরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হেড লাইটের আলোটুকুই ঈষৎ পথ দেখাচ্ছে। হীরাপুর গ্রাম রাস্তার পাশের একটি বাঁকা মোড় ঘুরে খানিকদূরে চলে গেলে পাওয়া যাবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই রাস্তায় এখন যেন গাড়ির মেলা লেগে গিয়েছে। গাড়ির মেলা মানে অন্ততঃ তিন চারটি বিশাল বিশাল বিদেশী গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

অশনিনাথ বললেন—বুঝতে পারলে তো, গাড়িগুলো সব চলেছে হীরাপুরের দিকে!

শিশির সোৎসাহে বলল, অশনিদা ওদের পেছন পেছন গেলে কেমন হয়?

—খুব ভালো হয়। কিন্তু একটু স্পীড্ কমিয়ে দিয়ে যেতে হবে! যাতে করে সবশেষে পৌঁছোয় আমাদের গাড়িটা। কারণ সবাই নেমে ভিতরে না ঢুকে গেলে আমাদের পক্ষে নামাটা অত্যন্ত রিস্কি হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের দেখলেই ওরা বুঝতে পারবে আমরা ওই দলের কেউ নই। এবং সেদিনের সেই গোলমালের নায়ক আমরাই। শারমার সেই পিশাচকে তো আমরাই সেদিন শেষ করে দিয়েছি। শারমা আমাদের দেখলেই এর বদলা নেবেই।

শিশির বলল,—কিন্তু অশনিদা ওই নারকীয় পুরাণে যা পড়লাম তা কি বাস্তবে সত্যি সত্যি ঘটে ?

—ঘটে না ?—অশনিদা গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে বললেন, আমি তো ছোটবেলায় গল্প শুনেছি আমাদের দেশের বাড়িতে এক পূর্বপুরুষের একমাত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। ছেলেটিকে যখন শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন হঠাৎ এক তান্ত্রিক এসে হাজির। সেদিন নাকি ছিল এক ভীষণ ঝড় বাদলের রাত্রি। সেই তান্ত্রিক বললেন যদি কেউ এই ঝড় আর হাওয়ার তোড় অস্বীকার করে নারকেল গাছের মাথা থেকে একটা ডাব পেড়ে আনে তাহলে আমি এই ছেলের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে দিতে পারি। এবং শোনা যায় সেই ডাব নিয়ে নিশি ডেকে ডেকে সে রাতে তিনি সারা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। শে পর্যন্ত একটি গরিব চাষীর ছেলের প্রাণ নিয়ে বাঁচিয়ে ছিলে ছেলেটিকে।

শিশির বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল অশনিনাথের মুখের দিকে

অশনিনাথ বললেন,—ওই চন্দ্রা মেয়েটিকে যেমন আয়ু-দেবার লো দেখিয়েছে, তেমনি শোভনকেও বোধহয় আয়ু আর ক্ষমতা দেবার লো দেখিয়েছে শারমা। আমার সেটাই দৃঢ় ধারণা। যাক, শেষ পর্য দেখা যাক ব্যাপারটা কদ্দূর গড়ায় ?

শিশির বলল, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এসব ঘটনা যে সত্যি ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না অশনিদা।

অশনিনাথ কিছু বললেন না। মৃদু হাসলেন শুধু।

চারিদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। হেড্ লাইটের আলো সেই অন্ধকারে হলদেটে হয়ে আসছিল। অশনিনাথ এবার গাড়ির স্পী অনেকটা স্তিমিত করে আনলেন। বললেন এবারে আমরা একটু পেছ সরে যাই শিশির। দ্যাখো গাড়িগুলো ওই দূরে, বনের পাশ দিয়ে বেঁ যাচ্ছে। দেখা যাক্ কতগুলো গাড়ি যায়। নিশ্চয়ই ওই রাস্তাট বেঁকে গিয়ে শৈবালকুটিরের কাছে গিয়ে পড়েছে। আর মাত্র এক

গাড়িই বাকি ছিল। গাড়িটা বুলেটের মতো পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর রাস্তার পাশে হেড্‌লাইট নিভিয়ে, গাড়ি থামিয়ে চুপ্‌চাপ বসলেন অশনিনাথ। শিশির বুঝতে পারলো অশনিনাথ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে চান। সে-ও চুপচাপ বসে রইল। জায়গাটা নীচু। স্যাঁতস্যাঁতে। জলা ধরনের। চারিদিকে কেবল লম্বা লম্বা ঘাসওয়ালা মাঠ আর একটু দূরে ঝুপসি একটা জঙ্গল। আকাশের গাঢ় অন্ধকারে তারাগুলো একটু একটু ঝিলমিল করছে। কিন্তু কুয়াশার পাতলা আবরণে ঝলমলে জ্যোতিটা স্পষ্ট নয়। এইভাবে কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর অশনিনাথ গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়িটা শব্দহীনভাবে চলতে শুরু করলো। আস্তে বাঁক নিল। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশাল প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকা। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে মিশে আছে। গাড়িটির সমস্ত আলোই নেভানো। নীচের তলায় মৃদু একটি-দুটি আলোর রেখা। বিদ্যুতের নয়। সম্ভবতঃ লণ্ঠনের আলো। কিন্তু সেই আলোর আভা হল্‌দেটে নয়। কেমন যেন নীল্‌চে ধরনের। অশনিনাথ গাড়িটা অনেক দূরেই থামালেন। তারপর ঝুপসি একটা াছের ছায়ায় বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। গাড়ি থেকে নমে হেঁটে চললেন তিনি। শিশির তাঁর পিছন পিছন চলল। অশনিনাথ বললেন, শিশির, একটা কাজ করলে আমরা অনেকটা ঝুঁকি এড়াতে পারি। চলো, আমরা মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটি। এই ভাবে হেঁটে আমরা শৈবালকুটিরের পিছন দিয়ে ঢুকতে পারব।

শৈবালকুটিরের আবছা আকারটা চোখের সামনে রেখে কাঁপতে াঁপতে, শিশির ভেজা ঘাসের উপর পা ফেলতে-ফেলতে দুজনে এগিয়ে লল। শিশির স্পষ্ট বুঝতে পারল শীতের কাঁপুনিটা কেবল বাইরে থকেই নয়, ভেতর থেকেও তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। একটা ভয়ঙ্কর জানা ভয়। এত ভয় শিশির এর আগে আর কখনো পায়নি।

ক্রমশঃ শৈবালকুটির যখন কাছে ঘনিয়ে এল অশনিনাথ বললেন— দখো পেছনের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নীচু। এখান দিয়ে ডিঙিয়েও াওয়া যেতে পারে।

শিশির চাপা গলায় বলল,—তা তো পারে, কিন্তু ভিতরে আবার ডালকুত্তা ছেড়ে রেখে দেয়নি তো ?

অন্ধকারে হেসে উঠলেন অশনিনাথ।

—না শিশির, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শৈবালকুটিরে আর যাই হোক কোনো কুকুরের দেখা তুমি পাবে না। প্রাণী বলতে বেড়াল ছাড়া আর কিছু থাকা সম্ভব নয়।

শিশিরের শরীরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। পাঁচিল পেরিয়ে ওপাশে লাফিয়ে পড়লেন অশনিনাথ। ওপাশের পাথরের ওপর একটু শব্দ হল। শিশিরও লাফিয়ে পড়ল। অন্ধকারে সরু প্যাসেজ ধরনের জায়গাটিতে বড় কয়েকটি জানলা। জানলায় মোটা কাচ লাগানো। কাচের বাইরে মোটা লোহার জাল। জালের গায়ে বহু দিনের জমে-ওঠা ময়লা দিয়ে ভিতরের বিশেষ কিছুই দৃশ্যমান হয় না। তবু নড়াচড় ছায়া শরীর দেখে মনে হচ্ছিল ভিতরে কিছু লোক গল্পগাছা, পানাহা করছে। অশনিনাথ মাথা ঝুঁকিয়ে খানিক্ষণ লক্ষ্য করতে করতে একটা ছিদ্র দেখতে পেলেন। তার মধ্য দিয়ে দেখে বললেন,—ওরা স গাড়ির শোফারের দল। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদে মেতে আছে এসব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছে। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না শিশির। চলো, অন্যদিকে যাই। দুজ মিলে ঘুরে ঘুরে বাড়ির অন্য একটি পাশে গিয়ে পৌঁছলো। এ পাশে একটি সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটি বোগেনভোলিয়ার লতা। লতার তলা দিয়ে মাথা নীচু করে যেতে গি দেখা গেল বেশ চমৎকার একটি গুহার মতো অন্ধকার আবেষ্টনী তৈরি হয়। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে পড় একটি জানলা। এ জানলাটির পাল্লা খোলা। কিন্তু ভারি লোহা জালের আবরণে ঢাকা দেওয়া। জালের ওপাশে গাঢ় বেগুনী রঙে ভেলভেটের পর্দা ফেলা রয়েছে। পর্দার ওপাশে মানুষের কণ্ঠের একটা চাপা শোরগোলের আওয়াজ। অশনিনাথের অসীম দুঃসাহসই বলতে হবে, তিনি মাটি থেকে একটা শুকনো সরু ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আ

আস্তে ভেলভেটের পর্দাটা কিছুটা ফাঁক করার চেষ্টা করতে লাগলেন। একচুল ফাঁক হতেই দেখা গেল ঘরের ভিতর মৃদু উদ্ভাসিত আলো জ্বলছে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার থাকায় ভেলভেটের পর্দা কতটুকু সরলো-না-সরলো সেদিকে ভিতরের লোকের চোখ পড়ার কোনো কারণই নেই। সেই সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল এক বৃদ্ধা মহিলার মাথা। মাথার নকল চুলের কারিকুরি যেন চূড়ার মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। তিনি যখনই পাশ ফিরেছিলেন তাঁর খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর সুঁচোলো চিবুক দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ডাকিনীর মুখের পাশের অংশটা দেখা যাচ্ছে। সন্তর্পণে ঝোপের তলা দিয়ে বেরিয়ে আর একটি জানলা পেলেন অশনিনাথ। সেই জানলার পাশে এক বিশাল নিমগাছ। জানলার পর্দা আরো বেশি ফাঁক করা। ভিতরের বেশ খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল তার ভিতর দিয়ে। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছে। তাদের বেশির ভাগই মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরা। এবং বেশির ভাগের চেহারাতেই বিকৃত ভোগের ছাপ। শরীর জরাগ্রস্ত এবং মুখের রেখায় অতৃপ্ত ভঙ্গী। হলের মাঝখানে পুরু কার্পেট বিছানো। কার্পেটের ওপর সোনালী রুপালী জরির কাজ। হলের শেষ প্রান্তে একটি উঁচু বেদী। বেদীর উপর অদ্ভুত লিপিতে কতকগুলি শ্লোক লেখা। শ্লোকগুলির অর্থ বোঝা যাচ্ছিল না। লিপিটাও অচেনা। অনেকটা জড়ানো জড়ানো ব্রাহ্মী-লিপির কাছাকাছি। কার্পেটের মাঝখানে একটি উঁচু চৌকিতে একটি নগ্ন মৃতদেহ শোয়ানো আছে। তার ঠিক তলাতেই একটি বড় ডাবর জাতীয় বাসন। বাসনটির ভিতর খানিকটা তরল পদার্থ রয়েছে। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, আর একটি খুন। পিশাচতন্ত্রের নামে আর একটি বলি!

শিশিরের সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে ভয় চলাফেরা করছিল। সে দেখল, মৃতদেহটির কাছে শারমা দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে রক্তবর্ণ আলখাল্লা। হাতে একটা দীর্ঘ জঙ্ঘা হাড়।

মন্ত্রোচ্চারণ যত প্রবল হতে লাগলো, ততই শারমার অনুচরেরা তার

দুপাশের ধুনুচিতে ধকধকে অগ্নির মতো পদার্থে একরকম দুর্গন্ধময় গুঁড়ো ছুড়ে দিতে লাগলো। ঘরটা ক্রমশ ভরে উঠতে লাগলো ধোঁয়ায়। ধোঁয়ার নেশায় মানুষ ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগলো। ধোঁয়ায় যে বিলক্ষণ মাদকতা আছে তা অশনিনাথ আর শিশিরের বুঝতে কষ্ট হল না। তারা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে দাঁড়াল একটু। ছায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল কতকগুলি স্ত্রী পুরুষকে ধরে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় যেন কোনো বিশেষ উৎসর্গের জন্য তারা আলাদাভাবে প্রস্তুত হয়েছে। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন—ওই দ্যাখো, ওই যে ক্ষীণ চেহারার ন্যুব্জ মানুষটি—ওই-ই শোভন। ইসস্ কী চেহারা হয়েছে শোভনের। মনে হচ্ছে দেহে আর কোন বল নেই। ধোঁয়ার আধিক্যে আবার সরে দাঁড়াতে হল তাদের। খানিকক্ষণ খোলা হাওয়ার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার পর, আবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো সেই ডাবর থেকে হাতায় করে চরণামৃতের মতো পানীয় বিতরণ হচ্ছে। জানলার কাছে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে কেমন যেন চঞ্চলতা।

শারমাও উত্তেজিত। তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও। একটা পুরোনো দেয়াল-ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল সবাই। যেন কারো অপেক্ষা করছে। কিংবা কোনো বিশেষ লগ্নের জন্য অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত শারমা কি যেন একটা আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে পড়ল। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে চলল।

অশনিনাথ আর শিশির পায়ে পায়ে এগিয়ে বাড়িটির সামনের দিকের অংশের প্যাসেজে পৌঁছলো। এবার যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। এবং একটি একটি করে গাড়িগুলি স্টার্ট নিতে থাকলো।

অশনিনাথ একহাতে শিশিরের হাতটা মুঠিয়ে ধরেছিলেন। শেষ গাড়িটাও যখন ছেড়ে চলে গেল তিনি বললেন,—দেখলে শিশির এ যাত্রায় কিন্তু ওরা ড্রাইভারকে নিল না।

শিশির রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—দেখলাম!

অশনিনাথ বললেন,—চলো, আর দেরি নয় আমরাও ওদের পেছু নিই।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই শিশির বলল,—অশনিদা একটা কথা, সেই মেয়েটিকে তো দেখলাম না। যাব বাড়িতে আপনি সোমনাথকে পাঠালেন। সেই চন্দ্রা। তারও তো আজ আসার কথা ছিল তাই না?

অশনিনাথ বললেন, ঠিক বলেছো, হ্যাঁ, চন্দ্রার তো আসার কথা ছিল! তার জন্যেই ওরা অত ছট্‌ফট্ করছিল। ওদের পৈশাচিক কার্যকলাপগুলো বোধহয় বিশেষ কোনো গ্রহের যোগে হয়। সেই সময়টাই বোধহয় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই চন্দ্রাকে ছাড়াই ওরা রওনা হলো। গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে বহু দূর থেকে একটি গাড়ির লাল টেল-লাইট লক্ষ্য করে এগিয়ে চলছিল অশনিনাথের গাড়ি।

অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকিয়ে আছে তাই ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল শিশির।

চন্দ্রা সিটের প্রায় কিনারায় বসেছিল। উত্তেজনায় ক্রোধে হতাশায় তার চোখ মুখ যেন গজ গজ করছে।

সোমনাথ মাঝে মাঝে আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, কিন্তু চন্দ্রার সে দিকে দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি সামনে। রাস্তার দিকে। বার বার সে খালি প্রশ্ন করছিল—আর কতখানি পথ যেতে হবে?—আর কতদূর বাকি আছে?

সোমনাথের কিন্তু সত্যিই নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। অশনিনাথের ওপরও তার রাগ হচ্ছিল। একটি মেয়ের জীবন-মৃত্যু নিয়ে এ ভাবে ছিনিমিনি খেলাটা অশনিনাথের পক্ষে ঠিক হয়নি। আজ যদি সত্যিই চন্দ্রার জীবনে কোনো দুর্ভাগ্য নেমে আসে তাহলে সোমনাথ নিজেকেও যে দায়ী না করে পারবে না। কারণ চন্দ্রার সঙ্গে মিথ্যে স্তোকবাক্যের খেলায়, সেও তো ছিল অংশীদার।

চন্দ্রা হঠাৎ রাস্তার পাশের একটি পাথর ম্যাপ্ আঁকা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল—একটু রাখুন তো!—আমরা ঠিক আসছি কিনা দেখি?

সোমনাথ গাড়ি থামালো। দু জনেই নেমে গেল। চন্দ্রা নক্‌শার ওপর আঙুল রাখতেই মনে হল দুটি রাস্তার মধ্যবর্তী একটি অংশের দিকে কে যেন তার আঙুলটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রা যেন কেমন স্বপ্নাশ্রিতের মতো গাড়িতে উঠলো। তারপর বলল—রাস্তাটা আমি এবার চিনতে পেরেছি। চলুন সোজা চলুন! যত তাড়াতাড়ি পারেন চলুন—

সোমনাথ গাড়ির স্পীড বাড়ালো। গাড়িটা উড়ে চলতে লাগলো। চন্দ্রা উদগ্র চোখে গাড়ির সিটের কিনারায় খাড়া বসে।

সোমনাথ সোজা যাচ্ছিল, হঠাৎ চন্দ্রা বলল,—এবার বাঁহাতি রাস্তা ধরুন—হ্যাঁ।

সোমনাথ বলল,—সে কি? আপনি শৈবালকুটিরে যাবেন না?

চন্দ্রা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে স্বপ্নাশ্রিতের মতো বলল—আপনাকে যা বলছি,—বাঁহাতি রাস্তাটা ধরুন না।

সোমনাথ সঙ্কীর্ণ লাল ধূলো ওড়া বাঁহাতি রাস্তাটা নিল। খানিকটা যাবার পর তার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা নিষেধ-এর বোধ কাজ করতে লাগল। সোমনাথের মনে হল সে একটা ভুল পথে, একটা বিপদের দিকে ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে। এ ভাবে যাওয়া উচিত নয় তার। খানিকক্ষণ বাদে আস্তে করে সে আর একটি রাস্তা ধরে আবার বড় রাস্তার ওপর উঠে এল।

চন্দ্রা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনি কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না? সেই বড় রাস্তায় নিয়ে তুললেন আবার আমার জীবনের প্রতি এতটুকুও মায়া নেই আপনার? সত্যি, আজ বুঝতে পারছি, একমাত্র শারমা ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই। তিনিই আমার একমাত্র শুভার্থী।

খানিকদূর যাবার পর রাস্তা আবার দু ভাগ হয়ে বেঁকে গেল। একটি বাঁকের কাছে এসে চন্দ্রা বলল,—এবার গাড়ি থামান। রাস্তার ছবি আঁকা বোর্ডটা আমাকে দেখতে দিন। সোমনাথ গাড়ি থামাল। চন্দ্রা বলল, দেখুন না নেমে, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি না?

সোমনাথ বলল,—ঠিক রাস্তাতেই তো যাচ্ছি—

না, যাচ্ছি না—

সোমনাথ অগত্যা গাড়ি থেকে নামল। সে বোর্ডের গায়ে আঁকা

রাস্তার দিক নির্ণয় করতে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে পিছন ফিরতেই শুনতে পেল গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে। বড় বড় লাফ দিয়ে ছুটে আসতে-না-আসতেই গাড়িটা ঘুরে গিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলল ফিরতি পথে।

সোমনাথ হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে পাশের বাঁকা রাস্তা ক্রশ করে সোজা অন্ধকার ঘাসী জমিতে নেমে গেল। তার কেমন যেন মনে হল সোজা হেঁটে গেলে চন্দ্রা যে রাস্তা দিয়ে আবার এতটা এগিয়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাবে, সেই রাস্তাটায় গিয়ে পড়বে। সোমনাথ তাই অন্ধকার মাঠ ভেঙে আড়াআড়ি পথে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। এবং সত্যিই সে দেখলো লালধুলোর একটা কাঁচা রাস্তার ওপর এসে সে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে যে সময়টা গেল, তাতে অতদূর ব্যাক্ করে আবার ফিরে আসতে চন্দ্রার কিছুটা সময় লাগবার কথা। সোমনাথ সেই শীতে অন্ধকারে অসহায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সে দেখলো লালধুলোর রাস্তা দিয়ে নয়, আরো দূরে মাঠের মধ্যে দিয়ে, ক্রমশঃ ঢালুর দিকে তার স্পোর্টস কারটা অদ্ভুত গতিতে, ওঠানামা করতে করতে, ঝাঁকানি খেতে খেতে চলেছে। এবং সেই ভাবে লাফাতে লাফাতে হঠাৎ কোনো গাছ, ঢিবি, বা বাড়িটাড়িতে ধাক্কা খেয়ে তার চেখের সামনে গাড়িটা উলটে গিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

সোমনাথ আর অপেক্ষা না করে পাগলের মতো পড়িমড়ি করে ছুটে চলল। স্পোর্টস কারটার জন্য তার জ্বলন নয়। তার সমস্ত অন্তরাত্মা তখন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে চন্দ্রার অবস্থার কথা ভেবে।

অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে সোমনাথের মিনিট পনের লেগে গেল। গাড়িটার কাছে এসে তখন সে পোড়াতেল, রেক্সিন আর তারের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু মানুষের পোড়ামাংসের গন্ধ নয়। গাড়ির আগুনের আলোয় জায়গাটা অন্ধকারের মধ্যে ভয়ঙ্কর ধরনের আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সেই আলোয় সে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলো চন্দ্রাকে। অনেকক্ষণ দেখার পড়ে সে লক্ষ্য করল কয়েক হাত দূরে একটি রঙীন স্কার্ফ পড়ে আছে। পাগলের মতো ছুটলো স্কার্ফ লক্ষ্য

করে। চন্দ্রারই স্কার্ফ। যে জায়গায় স্কার্ফটা পড়েছে, জায়গাটা কেমন যেন উঁচু হয়ে উঠে গেছে। যেন একটা খাড়াই দেয়ালের মতো সেখান থেকে পোশাকের একটা টুকরো যেন ঝুলতে দেখলো সোমনাথ। কি কাণ্ড, এতদূর ছিট্‌কে পড়েছে চন্দ্রা ?—সোমনাথ সেই খাড়াই-এর ওপর দ্রুতপায়ে উঠে গেল। উঠে গিয়ে সে দেখলো চন্দ্রার দেহটা একটা ঝোপের পাশে নীচে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ঢালুর দিকে নেমে যেতে গিয়ে, সোমনাথ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল জায়গাটা যেন একটা শুকিয়ে যাওয়া দিঘির মতো। কানা উঁচু একটা মস্ত বড় বাটি বসানো আছে যেন মাটিতে। নীচে নেমে গেছে তার তলা। সেই অনেক নীচে মধ্যদেশে আলেয়ার মতো ছোটাছুটি করছে নীল্‌চে আগুন আর মানুষের চলমান ছায়া।

সোমনাথ আস্তে আস্তে গড়িয়ে গিয়ে চন্দ্রার দেহটার পাশে গিয়ে পড়ল। চন্দ্রা তখনো অজ্ঞান। কপালে সামান্য রক্তের দাগ। গভীর হয়ে কাটেনি কপালটা থেঁতলে গেছে শুধু। কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে খুব মৃদু। থেমে থেমে। যেন অজ্ঞানতার অতল গর্ভের দিকে নেমে গেছে চন্দ্রা হঠাৎ।

চন্দ্রাকে পাশে রেখে সোমনাথ নীচের দিকে তাকালো। নীচে তখন আলোয় আলো হয়ে গেছে একেবারে মাঝখানের অংশটি। বড় বড় মশালের মতো দণ্ডের মুখে জ্বলছে নীল্‌চে শিখা ওঠা আলো। পীচ্‌ জাতীয় কোনো জিনিস পোড়ার গন্ধ উঠে আসছে সেখান থেকে। সে আলো আগুনের আলো নয়। অন্য কোনো ধরনের আলো। আলোর সেই মালার মাঝখানে ছোট উঠান মতো গোল জায়গাটিতে জড়ো হয়েছে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ। নীল্‌চে আলোয় তাদের পরনের আলখাল্লা ধরনের পোশাকগুলো ঝলমল করছে। সেই অদ্ভুত ভিড়ের মাঝখানে একটি সিংহাসনের মতো বিরাট বেদী আনা হয়েছে। বেদীর সামনে জ্বালানো হয়েছে মস্ত একটি কুণ্ড। কিন্তু সেই কুণ্ডে আগুন নেই। আছে অদ্ভুত সব কালোকালো চাঙড়। যা থেকে নীল বেগুনী সবুজাভ সব লকলকে শিখা উঠছে। ক্রমশঃ সেই বেদী ঘিরে,

কুণ্ড ঘিরে শুরু হয়ে গেল নৃত্য। নৃত্যের সঙ্গে পান-ভোজন। প্রচুর খাদ্য পানীয় রাখা ছিল পাশে। একজন বিশাল একটা জালা থেকে পাত্র ভরে ভরে দিচ্ছিল। আর একজন বিশাল একটা বারকোশ থেকে চাঙড় চাঙড় মাংস তুলে দিচ্ছিল। দু হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল উন্মাদ নৃত্যপর মানুষগুলো। নাচতে নাচতে অজান্তে তাদের শরীর থেকে আলখাল্লার আবরণ পড়ছিল খসে খসে। উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গদের সেই আচরণের মাঝখানে, সেই মধ্য বেদীতে হঠাৎ ধোঁয়ার আবরণ জমাট বাঁধতে আরম্ভ করল। একটা বিশাল অতিকায় মূর্তির আকার নিতে লাগলো ক্রমশঃ।

এই অন্ধকার ঠাণ্ডা রাতে, অজানা একটি জলাভূমিতে অনৈসর্গিক ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন মাথা ঘুরে উঠতে লাগলো সোমনাথের। সে ঝিম্ ঝিম্ মাথায় আস্তে হাত বাড়িয়ে চন্দ্রাকে ধরে রইল তবুও।

প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর দূরের গাড়িগুলির টেল লাইটের লাল আলোগুলো লাল লাল জোনাকীর মতো রাস্তা ছেড়ে একটা অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হেড লাইটের আলো জ্বেলে জ্বেলে নিশানা করে করে গাড়িগুলি একে একে থামলো। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বড় বড় বল্লমের মতো জিনিস, আরো নানা রকম আসবাবপত্রও ধরে ধরে নামালো ছায়া ছায়া স্ত্রী-পুরুষেরা। তারপর চলল সামনের অন্ধকারের দিকে। দূরে গাড়ি থামিয়ে আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন অশনিনাথ। সবাই হঠাৎ করে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর, যখন মানুষজনের সাড়া শব্দ আর পাওয়া গেল না আস্তে আস্তে দুজনে নামল। হাঁটতে হাঁটতে সাবধানে গাড়ি জাঙালের মধ্য দিয়ে দুজনে এগোলো উঁচু খাড়াই-এর দিকে। খাড়াইএর মুখের কাছে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় অশনিনাথ বললেন—এসো, এসো শিশির, ওই দ্যাখো, লোকগুলো কেন ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখন মনে পড়েছে এ জায়গাটা কটা পোড়ো শ্মশান। এই তলায় মড়া পোড়ানো হত। ওখান দিয়ে সরু একটা নালামতোও বয়ে গেছে। মড়া পোড়ার দুর্গন্ধ আর ওপরে উঠত না বা ঘুরতো.

না। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নীচের দিকে খানিকটা নেমে দেখতে লাগল নীচের ঘটনাগুলো। ওই তো সেই পলিত-গলিত লোকগুলো। স্ত্রীলোকগুলোও ওদের সঙ্গে রয়েছে। উন্মাদের মতো অঙ্গভঙ্গী করছে সবাই। মানুষ যদি তার সভ্য সুন্দর আবরণী থেকে বেরিয়ে এসে এমনি প্রাগৈতিহাসিক রূপ নেয়, তাহলে যেন মনে হয়, নরকই বুঝি আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। মাঝখানের বেদীর উপর ক্রমশঃ একটা বিশাল ধুম্রময় আকার জমাট বেঁধে উঠতে লাগল ওদের চোখের সামনে। শারমাকে দেখা গেল। পাগলের মতো কুণ্ডের চারপাশে ঘুরছে। তার যেন কোনো জ্ঞানই নেই। মিসেস কাপুরকেও দেখলো। ক্রমশঃ সেই বিশাল মূর্তিটি সুস্পষ্ট একটা আকার নিতে নিতে পরিণত হলো মহাকায় একটি ছাগমূর্তিতে। তার এক একটি ক্ষুর যেন এক একটি বিশাল থামের মতো। সেইগুলো ক্রমশঃ ধাতব, শাণিত আলোময় হয়ে উঠতে লাগল। ছাগমূর্তির দাঁতগুলো হলুদ। বিশাল। চোখে লাল্‌চে ঘন আলো। সেই অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে যেন পৈশাচিক একটা অভিব্যক্তি ফুটে আছে। সেই ছাগমূর্তির সামনে গিয়ে সবাই মাথা নুইয়ে নুইয়ে শরীর দোলাচ্ছিল।

অশনিনাথ আর শিশির অজান্তেই পরস্পরের হাত মুঠিয়ে ধরে ফেলেছিলেন। দেখা গেল ক্রমে সেই উন্মত্ত নৃত্য শেষ এলো। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি স্থানে কিছু লোক জটলা করছিল। তাদের মধ্যে থেকে ধরে ধরে নিয়ে আসা হল কয়েকজন মূর্তিকে। মূর্তি বলাই ভালো কারণ অত্যধিক মাদক পানের জন্যই হোক, কিংবা অন্য কোনো কারণে দুর্বলতাবশঃতই হোক তাদের কারোর মধ্যেই কোনো রকম চৈতন্য আছে বলে মনে হচ্ছিল না। শরীরের ওপর কোনো রকম দখল ছিল না বলেই, যেন যেমন তেমন করে গা ছেড়ে দিয়েছিল তারা। শারমা একটি বিশাল আকারের পুরোনো বালিঘড়ি এনে সামনে রাখতেই সেই বিশাল ছাগমূর্তি তার ধাতব ক্ষুর নেড়ে নেড়ে পাশবিক ভঙ্গি করে হেসে উঠল। তার পর একটি একটি করে মানুষকে তার সামনে এনে ফেলা হল। এবং সে প্রত্যেকের মাথায় ও সারা গায়ে তার সেই ক্ষুর বুলিয়ে

দিতে লাগলো। যখন এক একজনকে সেই প্রক্রিয়ার পর তোলা হতে লাগল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে আর সেই পতিত দলিত অবস্থা নেই। সবলে হেঁটে তারা যোগ দিল সেই নৃত্য-পানভোজনকারীদের দলে।

চাপা গলায় অশনিনাথ শিশিরকে বললেন—শিশির দ্যাখো, একেই বলে দীক্ষাদান। ওই মানুষগুলো এখন যে শক্তিতে বলীয়ান সে শক্তি হলো পৈশাচিক শক্তি। ওই পৈশাচিক শক্তিলাভের জন্য, ওরা ওদের আত্মাকে চিরকালের মতো শয়তানের হাতে তুলে দিল। এখন ওরাও হয়ে উঠবে এক একটি ক্ষুদে শয়তান। ওদের দিয়েই হবে পৃথিবীর ক্ষতি—

হঠাৎ চাপা গলায় শিশির বলল,—অশনিদা, ওই দেখুন, সারির শেষে ওরা কাকে আনছে ?

অশনিনাথ তাকিয়ে দেখে বললেন,—শোভন ! শোভনকে আনছে শিশির ! কি ভয়ানক ! শোভনকে একবার যদি ওরা দীক্ষিত করে ফেলে, তাহলে আর তো শোভনকে আমরা ফিরে পাবো না শিশির।

শিশির হতাশ কণ্ঠে বলল—কিন্তু আমরা আর কি করতে পারি অশনিদা ?

—একটা কিছু একটা কিছু করতেই হবে শিশির !

তাঁর হাত দুটি মুঠো হতে লাগল, খুলতে থাকল উত্তেজনায়। তিনি হঠাৎ বললেন—এসো, উঠে এসো শিশির। আমরা গাড়িতে উঠি। একটা কাজ করলে হবে। গাড়িটা সোজা চালিয়ে দেওয়া যাবে ওদের মাঝখান দিয়ে। তারপর আমরা দুজনে তুলে নেব শোভনকে। যা হয় হবে তার পর।

শিশির উঠে পড়লো। বলল চলুন, চলুন তাহলে !

দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি চালিয়ে ঢালু দিয়ে নামতে হবে। গাড়ির সামনের দুটি উজ্জ্বল, দুটি ছোট, মোট চারটি ফ্লাড্ আলো জ্বেলে, সোজা গাড়ি চালিয়ে দিলেন অশনিনাথ। অন্ধকার মাঠের মাঝখান দিয়ে হঠাৎ তীব্র আলোর ঝরনা ঝড়িয়ে ঝড়ের মতো

ছুটে চলল অশনিনাথের 'হিস্পানো'। অন্ধকারের মধ্যে মৃদু আভা জ্বেলে যে নীল্‌চে ধরনের অন্য আলো জ্বলছিল; তা যে এই তীব্র বিদ্যুতের পাশে কত নিষ্প্রভ, তা একপলকেই যেন প্রমাণিত হয়ে গেল। গাড়ি একপলকে নেমে গিয়ে সেই ভিড়ের শৃঙ্খলাকে যেন ছত্রখান করে দিল। নানারকম অনুষ্ঠানের সরঞ্জাম মশাল, মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে গাড়ি এগোতে লাগলো। সেই তীব্র আলোর বন্যায় শিশির স্পষ্ট দেখলো নারী পুরুষেরা—যেন সঙ্কুচিত হয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। আর সেই বিশাল বেদীর ওপর সেই ছাগমূর্তি ও যেন কেমন আকুঞ্চিত হতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে, হাওয়ায় শূন্যে মিলিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

অশনিনাথ দ্রুত ড্রাইভ্‌ করে গাড়িটা এনে ফেললেন অচেতন শোভনের পাশে। শোভনকে একটা বেদীর ওপর ফেলে রেখে তার সঙ্গীরা ততক্ষণে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামলো গাড়িটা, স্টার্ট দেওয়া অবস্থায় কাঁপতে লাগলো গাড়ির এঞ্জিন। থরথর শব্দ উঠতে লাগলো গাড়ি থেকে। তার মধ্যেই শিশির নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিল শোভনের দেহটা। গাড়ির পিছনের সীটে কোনোমতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও বসল পিছনের সীটে। অশনিনাথ এবার ফুল স্পীডে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন গাড়ি। অগভীর জলার জলকাদা দুপাশে ছিটিয়ে এগিয়ে গিয়ে উঠলেন মাঠের আর এক অজানা কিনারায়। সেখানে দেখলেন দুটি দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটি স্ত্রীদেহ এবং একটি পুরুষের। শিশির বলল ওদের তুলে নিলে হয় না অশনিদা ?

অশনিনাথ বললেন,—আমাদের এখন সময় নেই। তাছাড়া ওরা যে শয়তানের অনুচর নয়, তাই বা কি করে জানলে ? হয় তো আমাদের সঙ্গে পাঠাবার জন্য শারমা ওদের সাজিয়ে রেখেছে।

শিশির আর কিছু বলল না। হুশ্‌ করে গাড়ি বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অশনিনাথ আর শিশির জানতেও পারল না যে মাঠের ধারে পড়ে

আছে সোমনাথ আর চন্দ্রা।

অশনিনাথ গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

পিছনের সীটে গাড়িতে রাখা পুরু কম্বল দিয়ে নিরাবরণ শোভনকে মুড়ে নিয়ে চলেছে শিশির। গ্রামের-পর-গ্রাম, ধানক্ষেত জঙ্গল ভেদ করে চলেছে গাড়ি। আস্তে আস্তে ভোরের ছোঁয়া এসে লাগছে অন্ধকার কুয়াশা-মাখা আকাশের গায়ে। গাড়ি আস্তে একটি লোকালয়ে প্রবেশ করছে।

থানার কাছে এসে অশনিনাথ গাড়ি থামালেন। শিশিরকে গাড়িতে রেখে তিনি নেমে গেলেন থানায়। জায়গাটার নাম পাথর-পাড়া। গাড়ি এসে পৌঁচেছে বিহার বর্ডার পেরিয়ে সামান্য ভিতরে। পাথর-পাড়ার কাছাকাছিই যদ্দূর মনে পড়ছে তাঁর, ঘনশ্যামগড়। ঘনশ্যামগড়ে থাকে তাঁর বন্ধু দেবকান্ত রাও। দেবকান্ত ঘনশ্যামগড়ের রাজ-পরিবারের উত্তরসূরী। পাথর-পাড়ার পুলিস স্টেশনের ইন্সপেক্টর অফিস-ঘরেই ছিলেন। কি যেন একটা ডাকাতির তদন্ত সেরে তিনিও ফিরেছেন ভোর রাত্তিরে। অশনিনাথকে তিনি ঘনশ্যামগড়ের নিশানা দিয়ে দিলেন। অশনিনাথকে বললেন, তিনি যদি কোনো জরুরী খবর দিতে চান, তাহলে তাও দিতে পারেন টেলিফোন মারফৎ। ঘনশ্যামগড়ের দুর্গবাড়িতে দেবকান্ত রাও-এর টেলিফোনও আছে। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অশনিনাথ ঘনশ্যামগড়ে ফোন করলেন। দেবকান্ত রাওই ধরলেন ফোন।

অশনিনাথ সংক্ষেপে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা তিন জন ঘনশ্যামগড়ে দেবকান্ত রাও-এর আতিথ্য নিতে যাচ্ছেন। দেবকান্ত যেন তৈরী থাকেন।

দেবকান্ত রাও তো দারুণ খুশী। তিনি অশনিনাথের একজন বন্ধু এবং ভক্ত। তাঁর স্ত্রী উমা তো অশনিনাথের লতায় পাতায় ভগ্নী। কতদিন তিনি অশনিনাথকে ঘনশ্যামগড়ে কাটিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এই প্রথম বিনা নিমন্ত্রণেই তাঁকে পাওয়া গেল। সানন্দে অগ্রিম সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখলেন দেবকান্ত রাও। ফোন ছেড়ে দেবার আগে শেষ কথাটি অশনিনাথ যা বললেন, তাতে একটু চমকে গেলেন স্বয়ং ইন্সপেক্টরও।

—শোন্ দেবকান্ত, আমাদের জন্যে কিন্তু কোনোরকম আমিষের ব্যবস্থা করবি না। আর হ্যাঁ, তোরা স্বামী-স্ত্রী আর তোদের বাচ্চাকেও কোনোরকম আমিষ দিবি না। এর পর কলকাতায় ট্রাঙ্ক্ করে সোমনাথের জন্য, শ্রীমন্তের কাছে নির্দেশ রেখে, ইন্সপেক্টরকে আর একপ্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে অশনিনাথ সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

শিশির এবার বলল—আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি অশনিদা!

—ঘনশ্যামগড়। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, দেবকান্ত রাও। ওর গড়ে যাচ্ছি। চমৎকার গড়টা। একসময় সত্যিকার দুর্গ ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে ওই গড় থেকে। এক বিশাল বাগান সমেত গড়টাকে দেখতেই আছে আগের মতো। দেবকান্ত নষ্ট হতে দেয় নি বনেদী আর্কিটেকচারকে। কিন্তু ভিতরটা মোটামুটি মডার্ন করে নিয়েছে। আমি একবার রাঁচি যাবার পথে কিছুক্ষণের জন্যে উঠেছিলাম ওঁর গড়ে। অপূর্ব বাগ বাগিচা, অপূর্ব গড়। আর দেবকান্ত আর উমা দুজনে মানুষও খুব ভালো। বিদেশ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়ে এসেছে দেবকান্ত। উমাও ফার্মিং-এর কি সব ট্রেনিং নিয়ে ফার্ম করছে। ওদের ওখানে গেলে টাট্‌কা ডিম, মুর্গি, পর্ক, ভেড়ার মাংস খুব ভালো খেতে পারতে। কিন্তু আজ সব বারণ।

শিশির সকৌতূহলে বলল,—সে কী?

অশনিনাথ সামনের পাহাড়ে ওঠার আঁকাবাঁকা ফিতের মতো রাস্তাটির দিকে চোখ রেখে গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে বললেন, হ্যাঁ আমাদের আজকের সারাটা দিন আর সারাটা রাত শুদ্ধাচারে থাকতেই হবে। তার কারণ অমাবস্যার জের আজও শেষ হয় নি। আজ শারমা একবার শেষ চেষ্টা করবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, তোমার মনে আছে পরশু যে পিশাচমূর্তি পেয়েছিল সে আমাদের কাউকে হত্যা করতে পারে নি বলে ক্রুদ্ধ। তাকে ভেঙে ফেলে শারমার পাশবিক শক্তি অনেকটা খর্ব হয়েছিল। পরশু সেই খুন হওয়া নিষ্পাপ ডোমটির মৃতদেহের ওপর বসেও কোনো রকম

শবসাধনা করার সুযোগ পায় নি শারমা। তা সত্ত্বেও কাল রাতে অমাবস্যার ভয়ঙ্কর সময়ে আসল শয়তানকে নামাতে হয়েছে তাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শয়তান যাবার আগে একাধিক মানুষকে খুন করে গেছে—কারণ শয়তান নামিয়ে দীক্ষাদানের কাজও তো কাল পুরো করতে পারে নি শারমা। কথায় বলে—বার বার তিনবার। দুবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে শারমা। আজ রাত্রে সে শেষ চেষ্টা করবে। পিশাচলোকের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুদূতকে সে পাঠাবে আমাদের কাছে। আজও তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল শোভন।

গাড়ি পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামার ঢালুপথে খানিকটা-দূর এসে পৌঁছোলে, ভোরের প্রথম গোলাপী আলোয় সামনের পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল এক পাথরের দুর্গের গোল গোল গম্বুজ চূড়া।

শিশির মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই ক্রমশঃ কাছে আসতে থাকা এবং ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে থাকা দুর্গটিকে দেখতে লাগল। দুর্গের গেটের কাছে গাড়ি এসে পৌঁছোতেই ভারী লোহার দরজা সরিয়ে ঢুকলো গাড়িটা। দীর্ঘ সাজানো কেয়ারী-করা লতার বেড়া দেওয়া রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এসে প্রশস্ত গাড়িবারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালো। শিশির আর অশনিনাথ লোকজনদের সহায়তায় শোভনের জ্ঞানহীন কম্বলে জড়ানো দেহটি তুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বোধহয় গৃহকর্তা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। নীচের তলার প্রশস্ত ড্রইং-রুমের পাশের ছোট ঘরে শোভনের দেহটি একটি ডিভানে শুইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন অশনিনাথ। শিশিরের প্রথম দর্শনেই গৃহকর্তা দেবকান্ত রাওকে খুব ভালো লেগে গেল। তাঁর চেহারা প্রায় অশনিনাথের বিপরীত। গোলগাল মিষ্টি ধরনের চেহারা। খুব লম্বা নন। মুখে একটা সুন্দর মাধুর্য আঁকা। হাসিখুশি ভাব। তাঁর পরনে সাধারণ চোস্ত্ পায়জামা আর পাঞ্জাবি। তার উপর গাঢ় লাল রঙের জরির কাজ-করা জামিয়ার শাল। তাঁর পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন উমা। উমার পরনে খুব ঢিলেঢালা ম্যাক্সি। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। মাথার চুলগুলি এলো করে পিঠে ছড়ানো।

উমাই প্রথম কথা বললেন—এ কী অশনিদা, শোভনের কি হয়েছে? ওকে নীচের ঘরে শোয়াচ্ছেন কেন? ওপরে আমাদের ঘরে নিয়ে আসুন—ডাক্তারকে খবর দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি—

অশনিনাথ হাত তুলে বললেন—না উমা ডাক্তারের দরকার হবে না। আর শোভনকে এখন আমরা ওপরে তুলব না। তোদের দুজনের সঙ্গে আমি কিছু জরুরী কথা বলে নিতে চাই।

দেবকান্ত বললেন,—আহা বলবে বলবে, অশনিদা আগে চা-টা খাও, একটু বিশ্রাম করো।

—না, তোমাদের সঙ্গে কথা না শেষ করে আমি এ বাড়িতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করব না।

এবার উমা এবং দেবকান্ত দুজনেই একটু অবাক হলেন। চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে। অশনিনাথ বললেন,—চলো, ও ঘরে শোভন আছে। ওখানে বসেই নিরিবিলিতে আমরা কথাবার্তা সেরে নিই।

শিশির, দেবকান্ত ও উমাকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরটিতে গিয়ে অশনিনাথ দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর চারটি পুফে টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলেন চারজন।

দেবকান্ত বললেন, কি ব্যাপার অশনিদা, খুলে বলুন!

অশনিনাথ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটি উমা ও দেবকান্তকে বললেন।

উমা শুনে বললেন,—অশনিদা, এই কাহিনী যদি আপনি না বলে আর কেউ বলতেন তাহলে আমি তা কখনো বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের এখানে জলগ্রহণ করার সম্বন্ধ কী?

—শুধু জলগ্রহণ নয়, তোমাদের এখানে থাকাও আমাদের পক্ষে উচিত নয়। কারণ গত দু-রাত শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে, আমাদের দুজনের এবং সোমনাথের ভিতরে সব পবিত্রতা প্রায় দেউলে হয়ে এসেছে। এখন আমাদের চাই সতেজ পবিত্র আত্মার সাহায্য। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের দুজনের আত্মিক সাহায্য আমার দরকার। আজই আমাদের সংগ্রামের শেষ দিন। আজ সবচেয়ে ভয়ানক দিন। আজকের দিনটিতে যদি আমরা শোভনকে

শারমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি তাহলে আর শারমার পক্ষে শোভনকে কবজা করার সুবিধা হবে না।

দেবকান্ত রাও বললেন,—তোমার কি সন্দেহ আছে অশনিদা যে আমি কিংবা উমা তোমাকে এই অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবো ?

না, তোমাদের আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা যদি আজ রাত্রিটা এই বাড়িতে কাটাই, এবং তোমরা আমাদের সাহায্য করো, তাহলে কিন্তু তোমাদেরও শারমার কুনজরে পড়তে হতে পারে। এবং সে তোমাদের নানা রকম উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। উমা হেসে বললেন,—ক্ষতি ? নাঃ, কোনো ক্ষতি আমাদের হবে না। ক্ষতি করার সাধ্য কি শারমার। আমাদের এই দুর্গের চৌহদ্দিতে সে ঢুকতে পারবে ভেবেছেন আপনি ? পাহাড়ের প্রান্তে প্রান্তে আমাদের চৌকী বসানো চারিদিকে পাহারাদার।

অশনিনাথ হাসলেন,—কিন্তু শারমা যদি এমন কোনো দূত পাঠায় যে দূতকে কোনো প্রহরীই আটকাতে পারে না ? দেবকান্ত রাও বললেন,—আমি ওসব হোকাস্‌-বোকাসকে বিশ্বাসই করি না।

অশনিনাথ বললেন—কিন্তু আমি করি দেবকান্ত, আর সেই সঙ্গে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে যে যে-কোনো অনৈসর্গিক বিপদের উদয়ই হোক না কেন, আমি ঠিক সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো।

দেবকান্ত রাও বললেন—পারো-না-পারো অশনিদা তোমাদের আমরা ছাড়ছি না।

অশনিনাথ বললেন—বেশ ! আমরা থাকবো ! তবে একটা শর্তে ! তা হলো তোমাদের সবাইকে আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমার একটি কথাও অন্যথা করতে পারবে না তোমরা। তোমরা মানে, তুমি বা উমাই শুধু নয়। শিশির, এবং জ্ঞান ফিরে এলে শোভনকেও। তবে শোভন হয়তো স্বইচ্ছায় কিছু শুনবে না। তার ওপর জোর খাটাতে হবে।

উমা হেসে বললেন—শুনব ! শুনব অশনিদা ! এবার শোভনকে নিয়ে চলুন ওপরে ! আর আপনাদের জন্য চা-টা দিই।

অশনিনাথ মাথা নেড়ে বললেন—না কথাগুলো অত হালকাভাবে বললে চলবে না উমা। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথা যেভাবে নাবিকর শোনে, যুদ্ধের সময় সেনাপতির নির্দেশ শোনে সৈনিকেরা, সেভাবেই আমার সব কথা শুনতে হবে তোমাদের।

দেবকান্ত রাও হেসে বললেন—এ আর কি নতুন কথা হলো চিরকালই তো তোমার কথা ঐভাবেই শুনে এসেছি।

—বেশ চলো তাহলে; ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া যাক্। কি শোভনের কাছে কে থাকবে?

—আমাদের আয়া রানী থাকুক। ও আমার পুরোনো আয়া আমাকে মানুষ করেছে!

উমা তাঁর আয়াকে ডেকে শোভনের কাছে বসিয়ে ওদের নি গেলেন বিশাল সুসজ্জিত ডাইনিং হলে। টেবিলে স্তূপাকার আহারব দেখে অশনিনাথ পেছিয়ে এলেন। বললেন— করেছো কি উমা?

উমা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—কি আর করেছি?

—এই যে এত রকম আয়োজন, ডিম? পর্ক? লবস্টার?

—কত কষ্টে লবস্টার যোগাড় করেছি। আমি জানি আপ পছন্দ করেন। আপনারা আসছেন শুনে তাড়াতাড়ি আমা নীচু পাহাড়ীর ফিশারি থেকে আনিয়েছি—

অশনিনাথ বললেন—কেন? দেবকান্ত তোমাকে আমাদের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কোনো রেসট্রিকসনের কথা বলে নি?

—কৈ না তো?

দেবকান্ত রাও মাথা চুলকে, অপ্রস্তুত হেসে বললেন—স্যরি, ভু হয়ে গেছে!

অশনিনাথ বললেন—এ সব সরিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরে দি এসো। আমাদের জন্যে উমা তুমি নিজে গিয়ে চা দুধ পনীর আ রুটি নিয়ে এসো। ইচ্ছে করলে সামান্য ফলও আনতে পারো।

উমা বললেন—এখুনি সব ব্যবস্থা করছি, আপনারা তাহলে পাশে চা-ঘরে চলুন।

এরপর অশনিনাথ দ্রুত কাজে নেমে গেলেন। চা-খাবার খেয়ে সারা দুর্গবাড়িটা দেখতে বেরোলেন। অতি প্রাচীন বিশাল দুর্গ। দুর্গের ঘরের সংখ্যাই প্রায় দেড়শো। উইং আছে তিনটি। মূল প্রাসাদের নীচের তলায় দীর্ঘ লাইব্রেরী ঘর। সেই বিশাল ঘরের চারিদিকে ঘেরা প্যাসেজ। প্যাসেজে টানা কাচ দেওয়া জানলা। লাইব্রেরী ঘরটি সবে সারানো হয়েছে। রঙের শেষ-পোঁচ পড়েছে। ঘরটি খালি। বইপত্র সব সরিয়ে অন্যত্র রাখা হয়েছে। অশনিনাথ বিরাট হলঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর উমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এ অঞ্চলে সবচেয়ে পবিত্র নদী কী ?

সর্বতোয়া—স্বতোয়া বলে এখানকার লোক। আমরা পুজোর কাজে গঙ্গাজলের অভাবে স্বতোয়ার জলই ব্যবহার করি। সে-জল আমাদের এখানে মন্দিরে জালা ভরে ভরে রেখে দেওয়া হয়।

অশনিনাথ বললেন—বেশ, উমা তোমার ওপর ভার দিলাম এই বড়ঘর দেয়াল জানলা সমেত ধুয়ে, তার ওপর স্বতোয়ার জল ছিটিয়ে দেবে। তারপর সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে ধুনো গুগ্‌গুল দেবে ভালো করে। ঠিক ঘরের মাঝখানে একেবারে নতুন ব্যবহার না করা তোশক গদি পেতে বড় একটি বিছানা করবে। সবাই আজ নিরামিষ খাবে। তারপর শুদ্ধ বস্ত্রে স্নান সেরে সন্ধ্যে থেকে এই ঘরে এসে ঢুকবে, সারা রাত আর ঘর থেকে কোথাও বেরোবে না। আর হ্যাঁ, চাকর-বাকরদের বলে দেবে সন্ধ্যে থেকে তারা যেন তাদের মহলে চলে যায়। এবং টেলিফোনের লাইনও থাকবে না। কেটে দিতে হবে।

উমা বললেন আর আমার মেয়ে অশনিদা। তাকেও কি আমাদের কাছে রাখবো ?

—না না। মেয়ে থাকুক ওপরে ওর বেডরুমে। আয়ার কাছে শোয় তো ?

—হ্যাঁ, আমার আয়া রানীর কাছে !

—খুব ভালো। তাই-ই শোবে। কিন্তু ওকে কোনো আমিষ দিও না ?

— না, চাকরদের বলে দিয়েছি। ফ্রিজ থেকে পর্যন্ত সব আমিষবস্তু বের করে দিয়েছি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না! আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা!

— কি ?

—অন্য সিকিউরিটি !

দেবকান্ত রাও বললেন—আমিও তাই ভাবছি। ভাবছি যে চাকর-বাকর অন্য বিল্ডিং-এ থাকলে যদি বিপদ-আপদ হয় তারা তো আসতে পারবে না। তাছাড়া ফোনের লাইন ডিস্‌কানেক্‌ট্‌ করে দিলে যদি—

অশনিনাথ বললেন—তোমরা সিকিউরিটি দিয়ে সারা দুর্গ ঘিরে রাখো না। আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যদি বলি এই ঘরের বাইরে চাকর-বাকর মোতায়েন রাখলে, তাদের জীবন আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে, আমি সেই আশঙ্কা থেকে তাদের বাঁচাতে চাইছি তাহলে ?

দেবকান্ত রাও বললেন—তুমি যা বলবে, তাই-ই হবে অশনিদা।

অশনিনাথ বললেন—বেশ, তুমি তাহলে আমি যা-যা বলেছি অক্ষরে অক্ষরে পালন করো। শিশির শোভনের কাছে থাক। আমি একটু বেরোবো। আমি না ফেরা পর্যন্ত কিন্তু শোভন তোমাদের দায়িত্বে থাকছে। শোভনের কোনো ক্ষতি হলে আমি তোমাদের দায়ী করবো। আমি সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসছি। শারমার ছল-চাতুরি থেকে সাবধান।

শিশির বলল,—কিন্তু আপনি একা একা কোথায় যাচ্ছেন অশনিদা, যদি কোনো বিপদে পড়েন আপনাকে কে দেখবে ?

উমা বললেন, সত্যিই তো! অশনিদা আপনি বরং শিশিরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি আর উনি শোভনের দেখাশুনো ঠিকমতোই করতে পারবো। ভাববার কোনো কারণ নেই। হয় আমি, না হয় উনি কেউ-না-কেউ ওর কাছে থাকবই।

অশনিনাথ হেসে বললেন,— বেশ্! আমি তাহলে শিশিরকে নিয়ে যাচ্ছি।

শিশির অশনিনাথের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় উমা বললেন,—কিন্তু অশনিদা, সোমনাথের কি হলো ? কিংবা চন্দ্রার ?

অশনিনাথ বললেন,—তোমরা একটা কাজ করো কলকাতায় আমার বাড়িতে ট্রাঙ্ককল করো। শ্রীমন্তকে বলে দাও যে আমরা এই দুর্গে আছি। যদি সোমনাথের সম্ভব হয় তাহলে সোমনাথ যেন এখানেই চলে আসে—কিন্তু সঙ্গে কেউ থাকলে যেন না আসে।

উমা বললেন—বেশ। এখনি ট্রাঙ্ক বুক করছি।

শিশির আর অশনিনাথ বেরিয়ে পড়লেন।

অশনিনাথ উমাকে বিশেষ কতকগুলো গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমা সেই অনুযায়ী লোকজন লাগিয়ে, স্বতোয়ার জলে বিশাল হলটি পরিষ্কার করে জানলাগুলো বন্ধ করে শার্শি লাগিয়ে দিলেন। শার্শির কাচের ফাঁকগুলিতে তুলো ও মোম দিয়ে আলাদা একটি আস্তরও দিয়ে দিলেন। প্রতিটি ভেন্টিলেটারে ঝোলালেন গুচ্ছ গুচ্ছ রশুন, পাতিলেবু আর বিশেষ একটি বনজ লতার পত্রমুকুল। ঘরের চার কোণে ধূপধুনার প্রচুর আয়োজন রইল। একটি ফ্যামিলি খাটের আয়তনে ভারী গদি তোশক পাতালেন তিনি ঘরের মাঝখানে। মাত্রই কয়েকমাস আগে, অতিথিশালার জন্যে তৈরী হয়েছিল ওই গদি তোশক। সদ্য ধোয়া সাদা বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে, সেই উঁচু বেদীর মতো শয্যার মাঝখানে তিনি স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখলেন ধোপ-ভাঙা ওয়াড় দেওয়া কিছু বালিশ। তারপর ঘর নিজে হাতে বন্ধ করে তালা দিয়ে যখন ওপরে গেলেন তখন দেবকান্ত রাও শোভনের ঘরের সামনে বসে বই পড়ছিলেন। তিনি বললেন,—অশনিদার নির্দেশমতো শোভনকে স্পঞ্জ করে মাথা ধুইয়ে সদ্য ধোয়া পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর বোধহয় এবার জ্ঞান ফিরে আসছে।—তুমি কি ওর কাছে বসবে একটু ?

উমা বললেন,—আমি বসছি, তুমি বরং স্নান-টান সেরে এসো !

দেবকান্ত বললেন,—সেই ভালো আমি স্নানটা সেরে আসি। দেবকান্ত এগোতে যাবেন এমন সময় তাঁদের খাস বেয়ারা ভরত এসে বলল,—মা, আপনাকে নীচে একজন ডাকছেন !

—আমাকে ?

উমা অবাক্ হলেন !

কারণ উমাকে ডাকতে হলে, নীচের পাহাড় থেকে সাতটি চৌকি পেরিয়ে তবেই তার খাসমহলে পৌঁছোতে পারা যায়। তবে যদি কোনো চেনাজানা লোক হয়, কিংবা নীচের চৌকির পাহারাদারকে ঠিকমতো বোঝাতে পারে, যে সে কোনো কাজে আসছে তাহলে আর তাকে আটক করা হয় না।

উমা দেবকান্ত রাওকে বললেন,—তুমি বরং কলকাতায় অশনিদার বাড়ি ট্রাঙ্ক বুক করো, আমি তাড়াতাড়ি দেখাটা সেরে আসছি।

দেবকান্ত বললেন,—সেই ভালো!

উমা নীচে নেমে তাঁর নিজের ছোট বসবার ঘরে এসে খাস্‌বেয়ারা জমীর সিংকে বললেন,—কে লোকটি? নাম বলেছে কোনো?

জমীর সিং বলল,—হ্যাঁ মা, বললেন, সোমনাথবাবু!

—ওঃ, সোমনাথ, তা-ই আচ্ছা, আচ্ছা, এখ্‌নি আসতে বলো—

উমা সোফায় নিশ্চিন্ত হয়ে এলিয়ে বসে পাশের ত্রিপয়ের ফুলদানীতে রাখা সদ্য ফোটা কার্নেশনগুলোকে হাত দিয়ে আদর করছিলেন। দরজার কাছে পাপোষে মোলায়েম পা ঘষাব সঙ্গে সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কেউ বলল,—গুড্‌ মর্ণিং শ্রীমতী দেও।

উমা চমকে তাকালেন। এ তো সোমনাথের কণ্ঠস্বর নয়। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা থলথলে শরীরের মোঙ্গলীয় মুখের একটি প্রায়-প্রবীণ লোক। তার পরনে হাল্কা ব্রাউন রঙের বিলিতি স্যুট্‌। উমা কিন্তু বলার আগেই হাসিমুখে লোকটি এগিয়ে এসে উমার মুখোমুখি সোফায় বসল।

উমা কি যেন বলতে যাচ্ছিলো।

লোকটি উমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে কোমলকণ্ঠে বলল, মিসেস রাও, আমি বুঝতে পারছি, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে এ ভাবে আসা আমার উচিত নয়। কিন্তু এ ছাড়া আপনার কাছে পৌঁছোনোর কোনো উপায় ছিল না আমার। সত্যিকথা বলতে কি আপনার উপকারের জন্যই এই পথ নিতে হয়েছে আমাকে। আমার

নাম নিশা শারমা। আমি একটি তন্ত্র-সংস্থার সঙ্গে আছি। তামার কাজ মানব-কল্যাণ।

উমা ওষ্ঠ বিকৃতকরে বলল—ছাই মানব-কল্যাণ, আমি আপনার সংস্থার কথা সব জানি!

—না আপনি জানেন না। আপনি যা শুনেছেন তা যে সর্বৈব ঠিক তাই বা কি করে জানলেন। যারা অবিশ্বাসী, যারা বিপথগামী তারা আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেকরকম অপপ্রচার চালিয়ে থাকে, এবং তারা যথাযোগ্য শাস্তিও পায়। মনে রাখবেন মিসেস রাও, সে শাস্তি আমরা দিই না, আপনা থেকেই তাদের ওপর শাস্তি এসে পড়ে!

উমার কেমন যেন শিথিল বিমর্ষ লাগছিল নিজেকে। শারমার এই একটি কথায় সে যেন কেমন চমকে উঠল।

—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আমার বাড়িতে বসে আপনি আমার বন্ধুদের সমালোচনা করছেন?

—আহাঃ—উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন স্থির হয়ে বসুন উমা-দেবী, আপনাকে আমি কিছু কথা বলতে এসেছি। বলেই চলে যাব। আপনি বুদ্ধিমতী। এ সব কথা আপনার শোনা দরকার। এতবড় প্রাসাদের মালিকানা আপনাদের, পূর্বপুরুষদের এতবড় গৌরব ঐতিহ্য, আপনারা সামান্য ভুলের ফলে তাকে মাটিতে মিলিয়ে দেবেন না? না-না-না, এমনটা হতেই পারে না উমাদেবী আপনাকে আমি উমাদেবীই বলছি। আপনি—আপনি জানেন না আপনি কি আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। কি দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব আপনার। কি যৌবনশ্রী। আপনার মতো একজন মহিলা আমাদের সঙ্গে এলে আমরা তো জগৎ জয় করতে পারতাম। দেখুন আপনাকে এবার আসল কথাটা বলি—তার আগে আপনার ওই ত্রিপয়ে রাখা চকোলেটের বাক্সটা থেকে আমাকে একটা চকোলেট দিন না উমাদেবী······

উমা ডান হাতে ত্রিপয়ে রাখা কলিং বেলটা বাজাতে যাচ্ছিলেন তার বদলে চকোলেটের বাক্সটার দিকে হাত বাড়ালেন। বাক্সটা স্বপ্নাশ্রিতের মতো এগিয়ে দিলেন শারমার হাতে। শারমা একটা

চকোলেট মুখে পুরে দিয়ে এ গাল থেকে ও গাল করলো। উমা দেখতে লাগলেন। কুশ্রী ঝোলা ঝোলা গাল। গালের ভিতরে চকোলেট। তাঁর গা ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো। তারপর শারমার চোখে চোখ রাখতেই তাঁর মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠলো। শারমা অদ্ভুত একটা হেসে বলল.—এই যে আপনার বাড়ির একটি জিনিস আমি গ্রহণ করলাম, এইতেই আপনার অধিকারের আওতায়—আপনার আওতার মধ্যে আমি ঢুকে পড়লাম।

উম্যর অদ্ভুত মনে হতে লাগলো। তাঁর চোখের সামনে শারমার কুশ্রী চেহারাটা যেন ক্রমশঃ বদলে যেতে লাগলো। উমার মনে হতে লাগলো, যে লোকটা তাঁর সামনে বসে আছে, সে যেমন সুন্দর তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তার কণ্ঠস্বব, কথা বলার ভঙ্গী, তার হাসি সব কিছুই যেন মোহনীয়, আকর্ষণীয়। এত সুন্দর করে যেন আর কাউকে কোনদিন কথা বলতে শোনে নি উমা! শারমা বলে চলেছে—

হ্যাঁ কি বলছিলাম যেন, জানেন, তারপর আপনাদের বন্ধু শোভন, শোভনদের পরিবাবটি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে। সত্যি কথা বলতে কি শোভনই ওই পরিবারের শেষ বংশধর। ওর কাকা যখন আমার কাছে কেঁদে পড়লেন, ওকে যখন একবার আমি নির্ঘাৎ চোরাবালির মৃত্যু থেকে বাঁচালাম, তখন থেকেই ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেল। আপনিই বলুন না উমাদেবী না হলে বনের মধ্যে শোভন চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিল যখন, সেখানে আমি হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হলাম—তা সেই শোভন, যাকে আমি নতুন পরমায়ু, পূর্ণ স্বাস্থ্য, বাঁচার আনন্দ দিতে চাই, তাকে যদি কেউ ছল-ছুতো করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে আনে, বলুন, তাতে কি তার ক্ষতি করা হয় না? আমি তো ডাক্তারেরই মতো। ডাক্তার যেমন রুগীকে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব নেয়, আমিও তো তেমনি শোভনকে বাঁচিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছি। এ সবই আমার নিজের ইচ্ছায় নয়। আসলে কাজ করছেন সাক্ষাৎ 'কাল', 'নিশা'। তিনি যেখানে তাঁর ডানার ছায়া ফেলেন যেখানে দু-রকম ঘটনাই ঘটতে পারে। তাঁর ইচ্ছে মতো শক্তি, ক্ষমতা সুখ-সম্পদ সব আসতে পারে, আবার ঘনিয়ে

উঠতে পারে মৃত্যুর করাল ছায়া। যেমন আপনাদের সংসারে শোভনকে আপনারা আটকে রেখেছেন। কাল অমাবস্যার লগ্নে দু-একবার তাকে 'নিশা'—'কালের' পায়ে উৎসর্গ করার কাজে বাধা দিয়েছেন আপনার বিপথগামী বন্ধুরা। আজ এসেছে আপনার সংসারে অশান্তি মৃত্যু দুর্গ্রহ আমার জন্য—আপনার আব এ থেকে উদ্ধার নেই।

উমা বোধ করতে লাগলেন তাঁর মনের মধ্যে ক্রমশঃ শারমার কথাগুলো ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে। শারমার কথাগুলো দারুণ যুক্তিসঙ্গত। এখন মনে হচ্ছে, অশনিনাথ, শিশির এবং শোভন—এরাই উমার সংসারের চরম শত্রু এবং দুর্গ্রহ। বেশ ছিলেন উমা স্বামী কন্যা নিয়ে। আজ সকালে উঠে তাঁর ফার্মে যাবার কথা ছিল। তারপর তাঁদের ছোট্ট গার্ডেন হাউসে মিষ্টি একটা পিকনিক, সবই ভেস্তে গেল এই অনাহূত অতিথিদের জন্য। কিন্তু কেবল এই চিন্তাই মাথায় ঘুরছিলা না উমার। এই সঙ্গে আর এক চিন্তাও ঘুবপাক খাচ্ছিল তার মনের মধ্যে। সে চিন্তা হল ছোটবেলার এক অস্পষ্ট স্মৃতি। উমারা হলেন বিহারের আর এক পার্বত্য মহল্লার এক সর্দারের ঘরের মেয়ে। তাঁদের মহল্লায় এক ডাকিনী ছিল। বুড়ী থুড়থুড়ি ডাকিনী। সে যেদিকে তাকাতো সেদিকেই কেমন যেন ক্ষতি হয়ে যেত। ক্ষতি এবং মহামারী।

ডাইনী থাকতো দূরের একটা ফণিমনসার জঙ্গলে। কিন্তু কখনো কখনো সে লোকালয়ে ভিক্ষে করতে আসতো। উমার মা একবার বুড়ীকে ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেন। উমার ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বারণ করে দিলেন। বললেন বৌমা, ওকে ভিক্ষে দিও না। ওরা ডাইনী। ওদের সংসার থেকে কিছু দিতেও নেই, ওদের কাছ থেকে কিছু নিতেও নেই।

উমার মাথার ভিতর যখন প্রবল স্রোতের পিছন পিছন সেই স্মৃতির ক্ষীণ স্রোতটা দুলতে লাগলো, তখন সে শুনলো শারমা বার বার খালি বলছে,—তাহলে এক কাজ করুন, আপনাদের স্বার্থে, শোভনের স্বার্থে, শোভনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। উমার মনে হলো, ভারী সুন্দর, ভদ্র কোমল এই মানুষটি। ইনি সত্যিই তাঁর পরিবারের ও শোভনের ভালো চান। সত্যিই তো বাড়তি ঝামেলা নিজেদের ঘাড়ে

ঝুলিয়ে রাখার কি দরকার। শারমার কথামতো শোভনকে এদের হাতে তুলে দিলেই তো ভালো হয়।···তুলে দিলেই তো ভালো হয়···উমা যখন একথা ভাবতে শুরু করেছেন, তখনই হাসতে হাসতে, লাফাতে রানী-আয়ার হাত ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকলো তাঁর চার বছরের মেয়ে হাসি। খিল্‌খিল করে হেসে সে চকোলেটের বাক্সের দিকে ছুটে এলো।

—এই বুঝি আপনার মেয়ে, আহা ভারী লাভ্‌লি তো (এসো এসো খুকী চকোলেটের বাক্সটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসো তো ? তারপর, তুমি একটা খাবে, আর আমিও একটা খাবো। কি বলো ?

হাসি চকোলেটের বাক্সটা তুলে শারমার দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ উমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা চেতনার ছুরি ঝনঝন করে তাকে কাটতে কাটতে চলে যেতে থাকলো। ওই চকোলেটের বাক্স ছুঁয়ে শারমা চকোলেট নিয়েছে,—উমার ফুলের মতো মেয়েকে সে ছোঁবে এখন। তারপর হাসিও চলে যাবে ওর কবলে। উমার গা ঘৃণায় রিরি করে উঠতে লাগলো। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তার নিজস্ব বোধ, বৃত্তি প্রবৃত্তির ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগলো ক্রমশঃ। উমা চমকিত হয়ে বেল বাজলো। তারপর কঠোরকণ্ঠে হাসিকে ডেকে বলল,—হাসি, শীগগির এদিকে চলে এসো। ও লোকটির কাছে কিছুতেই যেও না

শারমা তখনো হাসছে।

—কি হলো ?—কি হলো উমাদেবী ?

উমা তাকিয়ে দেখলেন শারমার পিছনের দরজায় পর্দা তুলে এসে দাঁড়িয়েছে জমীর সিং আর হাজারী সিং, উমা এক হাতে মেয়েকে কোলের কাছে চেপে ধরে অন্যহাতে জমীর আর হাজারীকে ইশারা করে বললেন—এই লোকটাকে ভালো করে চিনে রাখো, এটাকে কক্ষণো আর অমাদের ঘনশ্যামগড়ের দুর্গের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবে না।

তীরের বেগে উঠে দাঁড়াল শারমা।

—কি বলছেন আপনি উমাদেবী ?

—কে উমাদেবী ? আমি মিসেস রাও,—এক্ষুনি বেরিয়ে যান আপনি॥ আমার হাসির দিকে কু-দৃষ্টি দিচ্ছেন ; এত বড় সাহস ?

—আমি কিন্তু আপনাদের বন্ধু ?

—বন্ধু ?—বন্ধুদের নামে নিন্দে করতে এসেছিলেন আপনি, লজ্জা করে না আপনার ?—ছিঃ আমি কি অপরাধই না করেছি। আমার ঘরে বসে আপনার কাছ থেকে আমাদের বন্ধুদের নিন্দে শুনেছি—ছিঃ—

জমীর আর হাজারী সিং-এর দিকে তাকিয়ে, শারমা দরজার দিকে এগোলো। যাবার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, শুনুন মিসেস রাও,—আপনার মেয়েটিকে আপনি খুব বেশি ভালোবাসেন তাই না ?—আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক্ কি করা যায় ?

উমা তীব্রকণ্ঠে বললেন—ভগবান আমাদের সহায়। আপনার চেষ্টায় কোনো সুফল হবে না জানবেন। আর আপনার ভয়ও আমি করি না।

শারমা তীব্রদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সোমনাথের যখন জ্ঞান হলো তখন চারিদিকে সকালের আলো ফুটে উঠ্ছে। তার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে চন্দ্রা। তার কপালের কাটা দাগটার রক্ত শুকিয়ে কাল্চে হয়ে গেছে। তার জ্ঞান নেই, না সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেটা বুঝতে পারছিল না। একটু দূরে জ্বলন্ত গাড়িটার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। তখনো পোড়া তেলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপর। আস্তে আস্তে উঠলো সোমনাথ। নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে নিয়ে রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। যদি কোনো গাড়ি বা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিন্তু ওই গ্রামীণ রাস্তায় গাড়ি আর কোথায়। আস্তে আস্তে শোভন, অশনিনাথ, শিশির, শারমা, মিসেস কাপুর এদের সকলের কথা মনে পড়তে লাগলো সোমনাথের। তার জানতে ইচ্ছে করল এদের কি অবস্থা হয়েছে। শোভনকে উদ্ধার করা গেল কিনা ? কিন্তু চন্দ্রার দায়িত্বও তো এখন তারই ওপর। চন্দ্রাকে এখুনি চিকিৎসা করা দরকার।

সোমনাথ রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখল দূরে সবজি নিয়ে কলকাতাগামী ট্রাক যাচ্ছে একটি-আধটি। খানিকবাদে গ্রামীণ সরু রাস্তা দিয়ে একটি গরুর গাড়ি আসতে দেখলো। শীতের কুয়াশা

আর নবোদিত সূর্যের লালচে রং লাগা সেই অদ্ভুত ভোরে সোমনাথের মনে হল গরুর গাড়িটা যেন কোন অলৌকিক লোক থেকে বেরিয়ে ক্রমশঃ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথও এগিয়ে গেল। হাত নেড়ে থামাল গাড়িটা। তারপরের কাহিনী সংক্ষেপ।

গরুর গাড়িটায় কেবল ছিল গাড়োয়ান। গ্রামে চালের বোরা রেখে আসছে সে। সেই খালি গাড়িতে চন্দ্রার অচেতন দেহটাকে তুলে যতদূর শহরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততদূর চলল। গাড়িটা কাছাকাছি পুলিসচৌকির কাছে এলে চন্দ্রাকে গাড়িতে রেখে অশনিনাথকে ফোন করল সোমনাথ। ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে যেমন ট্রাঙ্ককল হয় তেমন।

ফোন ধরল শ্রীমন্ত। না, অশনিনাথ, শিশির বা শোভন কেউ ফেরে নি। তবে অশনিনাথ সোমনাথকে জানাতে বলেছেন যে তিনি ঘনশ্যামগড় যাচ্ছেন। সঙ্গে আছে শোভন আর শিশির। তিনি ঘনশ্যামগড়ে সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে সোমনাথকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। এবং বলেছেন, সোমনাথ যদি একা আসে, তাহলে বাধা নেই আসার, কিন্তু সোমনাথ যদি সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসে তাহলে ঘনশ্যামগড়ে সে যেন না আসে। টেলিফোনে এই অদ্ভুত ধরনের নির্দেশ পেয়ে সোমনাথ অবাক্ হল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে ঘনশ্যামগড়ে চন্দ্রাকে নিয়ে যাওয়া বারণ তার পক্ষে।

কিন্তু চন্দ্রার দায়িত্ব যে কোনো বিবেকবান্ মানুষের মতোই তো সোমনাথের ঘাড়েই পড়ছে। সোমনাথ কি করে অসহায় মেয়েটার দায়িত্ব এড়ায়?

সে ফিরে গিয়ে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে তুলল চন্দ্রাকে। ক্ষতস্থানে ড্রেস করে সামান্য ব্রাণ্ডি খাওয়ানোর পর আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরল। চন্দ্রা জ্ঞান ফিরতেই অবুঝের মতো তাকালো সোমনাথেরা দিকে!

সোমনাথ হেসে বলল—কি?—কোথায় আছেন ধলুন তো?

চন্দ্রা বলল—আপনার কাছে!

— পালাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন ?

—পালাতে চেষ্টা করি নি বাঁচবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার জীবনের শেষ তো ঘনিয়ে আসছে।

হঠাৎ ছটফট করে উঠলো চন্দ্রা।

—আজ—আজ কত তারিখ বলুন তো ?

সোমনাথ বলল, যতই হোক না আপনি তো বেঁচে আছেন! চলুন নতুন জীবনের সন্ধানে আমরা দুজন কলকাতায় ফিরে না গিয়ে ঘুরে আসি বিহারের সুন্দর একটি জায়গায়।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সোমনাথের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলো হাসপাতালের বাইরে। সোমনাথের কোটের ভিতর পকেটে ছিল হাজারখানেক টাকা। সে কাছাকাছি মোটর ট্যাক্সির আড্ডায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এক বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে ধরল। ড্রাইভারটি দূরপাল্লার প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া দেয়। ঘনশ্যামগড় বহুদিন যায় নি সোমনাথ। ঘনশ্যামগড়ের কাছাকাছি বিশাল শিল্প-শহর বিশালপুর। সেখানে সুন্দর সুন্দর বিলাসবহুল হোটেল আছে অনেক। পাহাড়ের ওপর একটি হ্রদের ধারে ভারী সুন্দর নির্জন একটি হোটেল আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল—সেই ড্রিমল্যাণ্ড হোটেলেই ওদের দুজনকে পৌঁছে দেবে সে।

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে চন্দ্রা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—আঃ—মাথার ভারটা একটু একটু করে কাটছে এবার। শরীরটা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সোমনাথ বলল—শরীরের কি দোষ ? সারারাত এই শীতে হিমে মাঠের মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। বরং বলতে পারেন শরীরে আমাদের আসুরিক শক্তি আছে বলেই এত অত্যাচার সহ্য করার পরও নিমোনিয়ায় ভুগি নি।

চন্দ্রা বলল—কই আপনি তো বললেন না আজ কি বার ?

সোমনাথ বলল—আপনার খেয়াল আছে অজ্ঞান হবার পর ক'দিন চলে গেছে আপনার জীবন থেকে ?

চন্দ্রা তার সুন্দর চোখ দুটি তুলে বলল—না তো !

সোমনাথ শান্তকণ্ঠে জেনে-শুনে একটা মিথ্যে কথা বলল ।

—একটি পুরো দিন !

চন্দ্রা হেসে উঠে বলল—সত্যি বলছেন ?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি ! আপনার বয়স এখন পুরো একুশ বছর চার-চারটি দিন !

চন্দ্রা যেন সোমনাথের এই একটি কথায় গুটিকেটে বেরিয়ে আসা প্রজাপতিটার মতো রঙিন আর ফুল্ল হয়ে উঠল । সে দুহাতে সোমনাথের হাত দুটি চেপে ধরে বলল,—তাহলে আপনি সত্যি-ই বলছেন, আমি বেঁচে গেলাম । শারমার কথা মিথ্যে ?

—হ্যাঁ মিথ্যে ! পরিষ্কার মিথ্যে !

আবার মেঘলা ছায়া পড়লো চন্দ্রার মুখে ।

—না কী শারমা আমাকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে আমার পরমায়ু এনে দিল ?

—না-না-না ! আপনি তো দ্রুত গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেণ্ট করলেন । আপনাকে খুঁজতে এসে দেখলাম আপনি জ্ঞানহীন পড়ে আছেন । আর দেখলাম অনেক দূরে একটু নীচের দিকে শয়তানকে উৎসর্গ করার সেই সব ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে । যখন সেসব হচ্ছিল তখন তো আপনি আমারই পাশে শুয়েছিলেন ।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলল । সোমনাথের একবারও মনে হল না যে চন্দ্রাকে মিথ্যে কথা বলে সে অন্যায় করেছে । ন্যায়-অন্যায়ের কোনো নির্দিষ্ট তুলাদণ্ড থাকে কি ? চন্দ্রা যে মনের জোরেই তার সীমিত পরমায়ুর বাইরে চলে যেতে পারে, নতুন হয়ে উঠতে পারে ।

বিহার বর্ডার পেরিয়ে ট্যাক্সি এসে পৌঁছলো বিশালপুরের কাছাকাছি । তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে । 'ড্রিম-ল্যাণ্ড' হোটেলে যখন ট্যাক্সি এসে পৌঁছলো তখন বেলা তিনটে পঁয়তাল্লিশ । হ্রদের ঝকঝকে ময়ূরাক্ষী জলে বিশাল হোটেলের ছায়া পড়ে দুলছিল। ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া মিটিয়ে নামতেই সোমনাথকে ট্যাক্সিওলা বলল—হোটেলের পিছনে দেখবেন

চমৎকার ছোট ছোট কটেজ আছে। লেক ওদিকে বেঁকে গেছে। চমৎকার জায়গা।

সোমনাথ আর চন্দ্রা দৃষ্টি বিনিময় করে হাসল।

শীত-বিকেলের রঙিন আলোয় ড্রিম-ল্যাণ্ড হোটেলে যেন সত্যিই সোনালী রঙিন কল্পনার ছন্দ নেমে আসার আয়োজন চলছিল। সোমনাথ হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে পিছনের বিরাট বাগিচার ধারে—একেবারে হ্রদের উপর ছোট একটি কটেজ নিল। কটেজটিতে চূড়ান্ত আরামের আয়োজন। সুসজ্জিত কটেজে চন্দ্রাকে রেখে দুজন বেয়ারা মোতায়েন করে শহরে গিয়ে চন্দ্রার জন্য গোটা দুই ম্যাক্সি,, তোয়ালে অন্যান্য টুকিটাকি এবং নিজের জন্য পাঞ্জাবি গেঞ্জী পায়জামা কয়েক প্রস্থ কিনে কটেজে পাঠিয়ে দিয়ে সোমনাথ ঘনশ্যামগড়ে ট্রাঙ্ক করল।

ঘনশ্যামগড়ে ট্রাঙ্ক করে সোমনাথ দেবকান্ত রাওকে পেলেন। তাঁর কাছ থেকে অশনিনাথের নির্দেশ শুনে তার মন অপ্রসন্ন হল। প্রথম থেকেই অশনিনাথ চন্দ্রার ভালো-মন্দের কথা এতটুকুও ভাবছেন না। সঙ্গে কেউ থাকলে যদি ঘনশ্যামগড়ের দুর্গে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সোমনাথ নিজেও সেখানে যাবে না। চন্দ্রাকে একা ফেলে কাপুরুষের মতো ঘনশ্যামগড়ে বন্ধু-বান্ধবের নিরাপদ আশ্রয়ে ডানা-মুড়ে বসে থাকার মতো চরিত্র সোমনাথের নয়।

সোমনাথ শুনলেন অশনিনাথ আর শিশির তখনো ফেরেনি। তারা শোভনকে রেখে বেরিয়ে গেছে। তবে অশনিনাথ বলেছেন পাঁচটা নাগাদ ফিরবেন। সোমনাথ অগত্যা ফোন ছেড়ে দিল। পাঁচটার সময়ই এসে আবার না-হয় ফোন করবে। সত্যি কথা বলতে কি চন্দ্রার ব্যাপারে সোমনাথ একা একা সমস্ত দায়িত্বটা মাথায় নেওয়ার ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না।

সোমনাথ কটেজে ফিরে গিয়ে দেখল চন্দ্রা স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে লাউঞ্জে বসে হ্রদের জলে রঙিন সূর্যাস্ত দেখছে। সোমনাথকে দেখে হেসে বলল—নতুন পোশাকের জন্য ধন্যবাদ। যান স্নান-টান সেরে একটু রেস্ট নিন, আপনি আসবেন বলে এখনো চায়ের অর্ডার দিই নি।

সোমনাথ হেসে চন্দ্রার দিকে তাকাল। চন্দ্রার চোখ দুটি কোমল আভায় ভরে আছে। সদ্যোস্নাত ঈষৎ অসমতল গালে ঝকঝক করছে গোধূলির আভা। স্তরে স্তরে সাজানো খোলা চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমেছে গাঢ় ভেল-ভোটিনের ম্যাক্সির উপর। সোমনাথ চন্দ্রার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল—এখনো তুমি আমাকে আপনি বলবে চন্দ্রা ?

চন্দ্রা চোখ তুলে তাকিয়ে একবার চকিতে সোমনাথকে দেখে নিয়ে ঝট্ করে চোখটা নামিয়ে নিল। তার কোমল মুখে ফুটে উঠল মৃদু একটি হাসি।

সোমনাথ স্নান করতে চলে গেল।

সোমনাথ যখন সতেজ হয়ে ফিরে এলো তখন সূর্যাস্তের শেষ রঙ লাল লাল ছড় টেনে জেগে উঠেছে পশ্চিম আকাশের নীল মেঘের প্রান্তে প্রান্তে। কুয়াশার হালকা একটি স্তর ধীরে জেগে উঠছে নীল সবুজ শান্ত হ্রদের বুকে। দূরে লাল হলুদ পালতোলা বোটের শান্ত সঞ্চরণ।

সোমনাথ দেখল টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম এসে গেছে। সামান্য কটি বিস্কিট সঙ্গে।

সোমনাথ বলল,—চন্দ্রা তোমার খিদে পায় নি ? আমার তো খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। আর তুমিও তো কিছু খাও নি। তাছাড়া অতটা কেটে গিয়েছিল তোমার কপাল। রক্তও তো কম পড়ে নি। এখন হাই-টি খেয়ে নাও। পরে না হয় দেরিতে ডিনার খাওয়া যাবে।

বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিল সোমনাথ। প্রণ কাটলেট, হ্যাম স্যাণ্ডুইচ, চিজ-ফ্রাই।

চন্দ্রা হাসল, তুমি জানলে কি করে আমি ঠিক এই আইটেমগুলোই খেতে ভালবাসি ?

—গত জন্ম থেকে।

হাসল সোমনাথ। আস্তে আস্তে চন্দ্রার কোমল করতলটি নিজের হাতে তুলে নিল সোমনাথ। তার মনে হল এই হাতটির সঙ্গে সে যেন এই মেয়েটির সুখ-দুঃখ অতীত-ভবিষ্যৎ সবই নিজের হাতে তুলে নিল। সোমনাথের হঠাৎ মনে পড়ল—পাঁচটার সময় অশনিনাথ ঘনশ্যামগড়ে

ফিরবেন। তখন তাঁকে ফোন করতে হবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চায়ের টেবল থেকে উঠেপড়ে চন্দ্রাকে বলল,—এখুনি একটা ট্রাঙ্ক্ বুক করে আসি চন্দ্রা !

—কাকে ?

—অশনিনাথকে !

—ও !

ট্রাঙ্ক বুক করে যখন ফিরে এলো সোমনাথ চন্দ্রা তখন সবে চা ঢালার আয়োজন করছে। চা খেতে খেতে চন্দ্রা বলল,—তোমার বন্ধু কোথায় ?

—ঘনশ্যামগড়ে। এই বিশালপুর থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়।

—তুমি যে আমার সঙ্গে থাকছো তাতে তোমার বন্ধু চটছেন না তো।

—না না। আমার বন্ধু তো তোমাকেও বাঁচাতে চেয়েছিলেন চন্দ্রা শারমার হাত থেকে। এবং তুমি শুনে খুশী হবে আমাদের মিশন সাকসেস্ফুল হয়েছে। শারমা শোভনকেও শেষ পর্যন্ত শয়তানের রাজ্যে পাঠাতে পারে নি। শোভনকেও উদ্ধার করে আনা হয়েছে আমাদের আশ্রয়ে।

খেতে খেতে চন্দ্রা বলল, সত্যি কি মোহেই না পড়েছিলাম। কি ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। আমি তো আজ চলেই যেতাম শয়তানের রাজত্বে। কালই তো আমার শেষ দীক্ষা ছিল। পরমায়ুর শেষ দিনও ছিল। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ?……

সোমনাথ হেসে বলল—কী ? কী মনে হচ্ছে ?

—মনে হচ্ছে, এই যে তোমার সঙ্গে আসা, এখানে থাকা, এই সমস্তটা একটা স্বপ্ন নয় তো ?

—না, না, এটা কেন স্বপ্ন হবে? বরং এর আগেরটাই ছিল স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন।

ভিতরে সোমনাথের বেডরুম থেকে টেলিফোন বেজে উঠল।

সোমনাথ বলল,—এখুনি আসছি চন্দ্রা, পাঁচ মিনিট !

কিন্তু কথা বলা শেষ করে ফিরে আসতে সোমনাথের দুমিনিটের বেশী লাগল না। অশনিনাথের আশ্চর্য ব্যবহারে সোমনাথ মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করছিল। সোমনাথের মুখের অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বলল,—কি হলো ? কোনো খারাপ খবর নাকি ?

সোমনাথ শুকনো হেসে বলল,—না-না খারাপ খবর না। শোভনের জ্ঞান ফিরেছে। শোভন ভালোই আছে। কোনো চিন্তার কারণ নেই আর। অশনিদা তোমার বিপদ কেটে গেছে শুনে খুব আনন্দ করলেন। বললেন এই হোটেলেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে।

চন্দ্রা বলল,—তা-তো দেবো। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে। অনন্তকাল ধরে তো আর আমরা এই ড্রিমল্যাণ্ড্ হোটেলে কাটিয়ে দেব না?

সোমনাথ বলল,—কেন, আমার ওপর কি তুমি নির্ভর করতে পারছ না? চলো আমরা বাগিচায় একটু বেড়াই। এর পর সন্ধ্যে নেমে গেলে তো ঘরের মধ্যে এসে বসতেই হবে। বেড়াতে বেড়াতে আমার পরিচয় তোমাকে দিতে চাই।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। পাশাপাশি তুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাগিচার মধ্য দিয়ে চলল। মাঝারি আকারের পাহাড়ের টিলায় উঠে গেছে বাগানটি। আঁকাবাঁকা পথ। পথের তুপাশে বনের মতো করে গাছপালা সাজানো। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে একপাশে পাহাড় একপাশে হ্রদ। হ্রদের জলে দিনের আলোর ঝিকিমিকি ক্রমশঃ কমে আসছে। টুপ্ টাপ্ করে জ্বলে উঠছে মৃতু বিত্যুতের আলো। ঘোরানো ঘোরানো তরুবিথীর তুধারে আলোর মালাগুলি দূরে দূরে সাজানো।

কথা বলতে বলতে চন্দ্রা আর সোমনাথ সেই তরুবিথীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সোমনাথ তার কাজকর্ম বাড়ি-ঘর সংসার-পরিবার পছন্দ-অপছন্দের কথা বলে যাচ্ছিল। চন্দ্রা মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু ক্রমশঃ চন্দ্রার মনের পর্দায় বার বার ফুটে উঠতে লাগলো সেই অর্ধভুক্ত মাছ মাংসের প্লেট ছড়ানো লাউঞ্জের টেবিলের ছবি। কেমন যেন শরীরের ভিতর থেকে একটা অত্যধিক আমিষ খাওয়ার বিবিমিষা পাক মারতে থাকল। সে আস্তে আস্তে চারিদিকে তাকালো। যে হ্রদ যে পাহাড় উদ্যান তার এত ভালো লাগছিল সেই উদ্যান হ্রদের উপর থেকে ভালো লাগার রঙীন আস্তর যেন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে! তার বদলে তাল তাল অজানা অন্ধকার দীর্ঘ দীর্ঘ ভয়াল ছায়া যেন ডানা মেলে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে চন্দ্রাকে।

এই অন্ধকারের পদধ্বনি যেন সোমনাথ শুনতে পাচ্ছিল। ক্রমশঃ সেও নিশ্চুপ হয়ে গেল। তার মনে পড়ল ট্রাঙ্কে অশনিনাথের সঙ্গে তার শেষ কথোপকথনের কথা।

অশনিদা আমি, সোমনাথ বলছি!

—কোথা থেকে?

—ড্রিমল্যাণ্ড হোটেলের বিশালপুর থেকে বলছি!

—তোমার সঙ্গে চন্দ্রা আছে?

—হ্যাঁ আছে।...অশনিদা, আমি ঘনশ্যামগড়ে যেতে চাই!

– না। তুমি চন্দ্রাকে নিয়ে এখানে আসতে পারবে না!

—অশনিদা আজ চন্দ্রার জীবনের শেষ দিন! অবশ্য তার নিজের বিশ্বাস মতে। তুমি তাকে একটু সাহায্য করবে না?

না। উপায় নেই। তুমি, আমি, শিশির—আমরা সব ক্লান্ত, ফাঁকা হয়ে গেছি। আমাদের আর কোনো শক্তি নেই। ওই চন্দ্রা মেয়েটি আর শোভন তো 'মাইনাস-পাওয়ার' বলতে পারা যায়। অথচ আজই হল আমাদের সংগ্রামের ভয়ঙ্কর শেষ দিন। এ দিনের যুদ্ধ সব চেয়ে প্রচণ্ড। এ দিনের জন্যে আমাদের বিশেষ ধরনের প্রিকসান নিতে হচ্ছে। সুতরাং আমি এখুনি টেলিফোনের লাইন কেটে দিচ্ছি। তুমি চন্দ্রাকে নিয়ে সাবধানে থাকো। আর যত বিপদই আসুক তোমার জন্যে আমার কোনো ভাবনা নেই। তবে আজ রাত্রের মধ্যে আর ঘনশ্যামগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না। ছাড়ছি –

সোমনাথ নিজের জন্যে সত্যিই কিছু ভাবে না। কিন্তু যার জন্যে তার ভাবনা, যাকে সে ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, যাকে সে নিজের দায়িত্বে শারমার নারকীয় ক্রিয়াকলাপের সামিল হতে দেয় নি তার সম্বন্ধে অশনিনাথ পরোক্ষে যা বললেন তাতে তো তার ঘোর বিপদেরই ইঙ্গিত দিলেন।

চন্দ্রার পাশে পাশে সোমনাথ এইসব চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছিল

খানিকক্ষণ বাদে চন্দ্রা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল। তারপর সোমনাথের দিকে ফিরে বলল,—চলো, ভিতরে চলো, আমার ভালো লাগছে না। আমার কেমন যেন শীত শীত করছে।

সোমনাথের এই ড্রিমল্যাণ্ড হোটেলের নির্জন কটেজে কেমন যেন একা অসহায় লাগতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে যখন কটেজে ফিরে এল তারা তখন কটেজটাকে আর সুপার মনোরম আরামপ্রদ লাগলো না তাদের। সদরে দাঁড়িয়েছিল দিনের দুটি বেয়ারা। তারা এখন বিদায় নেবে। রাতে এখানে বেয়ারাদের থাকার ব্যবস্থা নেই। রাতের প্রহরীরা একটু পরেই রোঁদে বেরোবে। সুতরাং কোনো রকম ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাছাড়া এসব অঞ্চল অত্যন্ত সুরক্ষিত আর নিরাপদ। রাতের খাওয়ার জন্য সোজা কিচেনে হেড 'শেফ'-এর কাছে ফোন করে বলে দিলেই ডিনার সার্ভ করে যাবে। বেয়ারারা চলে যাবার পর সোমনাথ চন্দ্রাকে নিয়ে কটেজের ভিতর ঢুকে ভালো করে দরজা লক্ করে দিল। দুজনে মিলে কাচের পাল্লা, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো সব টেনে বন্ধ করে পর্দা টেনে সমস্ত কটেজটা অন্ততঃ নিরাপদ করে বসবার ঘরে এসে পাশাপাশি সোফায় বসল। মৃদু একটি শেডেড ল্যাম্প জ্বলছিল ঘরে। মেঝেয় নরম কার্পেটের ওপর সোফা সেটী পাতা। রেডিওগ্রামে বাজছিল রবিশঙ্করের সেতার। ছোট কটেজটি। মাঝখানে বসবার ঘর দুপাশে দুটি বেডরুম। কটেজ ঘিরে বাইরের লাউঞ্জ। দুটি বেডরুমে দুজনের শোবার আয়োজন। দুজনেই কিছুটা ক্লান্তিবোধ করছিল। চন্দ্রার পক্ষে কত দিন হল কে জানে?

সোমনাথের পক্ষে তো দীর্ঘ দীর্ঘ তিনটি দিন ধরে যে মানসিক চাপ পড়ছে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দুজনে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন, সুখ-দুঃখের কথা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে করতেও কেমন যেন হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ হঠাৎ সামান্য খুটখাট শব্দেও কেমন যেন একটা চমকেওঠা ভয়। যেন কটেজের চারপাশে একটা ভয়ঙ্কর অজানা কিছু আস্তে আস্তে জাল গুটোতে গুটোতে এগিয়ে আসছে।

চন্দ্রা উঠে রেডিওগ্রামটা বন্ধ করে দিল। তার ভালো লাগছিল

না আর। সোমনাথ খানিকক্ষণ কলেজ জীবনের হাসির গল্প বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও জমল না। এভাবেই সময় এগোতে এগোতে ঘড়িতে যখন দশটা বাজলো তখন ডিনারের অর্ডার পাঠালো সোমনাথ। বিস্তারিত পদ। কাঁকড়া-নারকেল, কচ্ছপের ডিমের কষা, ভেটকির রোস্ট, মুরগির ফ্রাই, মাটন রেজালা আর সাদা ঘি-ভাত। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতে চুকতে রাত বারটা বাজল। কফি খাওয়ার অজুহাতে রাত একটা। তারপরও চন্দ্রা সোমনাথের কাছ থেকে যেতে চাইছিল না।

সোমনাথ বুঝতেই পারছিল, চন্দ্রা অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল ভয়ানক ভয় পাচ্ছে বলে সোমনাথকে ছাড়তে চাইছে না। সোমনাথ শেষ পর্যন্ত বলল,—চন্দ্রা তুমি কেন এত নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ? নার্ভাস হবার মতো কোনো কারণ ঘটেছে কি?

চন্দ্রা ফ্যাকাশে মুখ তুলে বলল,—না ঘটে নি। কিন্তু আমি কেন স্বস্তি পাচ্ছি না সোমনাথ। আমার বুকের ভিতরটা এত ধড়ফড় করছে কেন? আমার কেবল মনে হচ্ছে আমাদের বিপদ কাটে নি সোমনাথ। বিপদ যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে দু-হাতে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে বলল,—চন্দ্রা, চন্দ্রা, আমার এই দু হাতের বেড়ার মধ্যে থেকে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না চন্দ্রা। যাকে তোমার ভয়, সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতও না!

চন্দ্রার মুখে একটা তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠল যেন।

সোমনাথের বুকে মাথা রেখে খানিকক্ষণ সে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলল।

সোমনাথ বলল,—চন্দ্রা এক কাজ করা যাক্। আজকে আর রাতে আমরা নাই বা শুলাম। এসো আজ সারারাত আমরা এই ড্রইংরুমে জেগে গল্প করে বাজনা শুনে কাটিয়ে দিই। দাঁড়াও তোমাকে আমি ভালো করে, আরাম করে বসিয়ে দিই। সুন্দর নরম একটি গভীর সোফায় নরম নরম কুশন দিয়ে তার মাঝখানে চন্দ্রাকে বসিয়ে

ভেলভেটের কুইশট্ দিয়ে তার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কার্পেটের ওপর তার হাঁটুতে গাল রেখে বসল সোমনাথ।

চন্দ্রা সোমনাথের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো কোমল ছোঁয়ায়।

আস্তে আস্তে রেডিওগ্রামের সঙ্গীত মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সারা ঘরে। সোমনাথের দু-চোখ ভরে ধীরে ধীরে গভীর ঘুম এসে নামতে লাগলো। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো চোখ খুলে রাখার। কিন্তু তার মাথার ভিতর ক্লান্তি আর প্রগাঢ় ঘুমের মিশ্র একটা অনুভূতি এমনভাবে ঘুরতে লাগলো যে সে কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারল না। আস্তে আস্তে গাঢ় ঘুমে মগ্ন হয়ে সে চন্দ্রার কোলেই ঢলে পড়লো।

চন্দ্রা সোমনাথকে লক্ষ্য করছিল ঘুম ঘুম চোখে। কিন্তু সোমনাথ সত্যিই যখন গাঢ় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল, তখন চন্দ্রা আপন মনেই অদ্ভুত হেসে উঠল একটু। যেন নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই এই হাসি। হঠাৎ চন্দ্রার চোখ পড়ল সামনের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের দিকে। ক্যালেণ্ডারের গায়ে সেদিনের তারিখের চারপাশে প্লাষ্টিকের একটি ফ্রেম দেওয়া। ট্রেণ্ড বেয়ারা সেদিনের তারিখের ওপর ঠিকমতো ফ্রেমটি টেনে দিয়েছে। তারিখ দেখে বার মিলিয়ে চম্‌কে উঠলো চন্দ্রা। তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেল। তার দু-হাতের আঙুল কুঁকড়ে উঠলো। তীব্রকণ্ঠে সে বলল,—সোমনাথ! সোমনাথ! তুমি জেনেশুনে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? আমার মৃত্যুদিন চলে যায় নি তাহলে?—তাহলে আজই,—আজই সেই ভয়ঙ্কর দিন?

সোমনাথের মাথাটা সোফার ওপর আলগোছে নামিয়ে রেখে চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মাঝখানে হেঁটে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে হা—হা করে খুলে গেল সব দরজা জানলা। ঘরের বিদ্যুৎকে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল কে। নিজের অজান্তেই চন্দ্রা হেঁটে চলল কটেজের বাইরে।

ভিতরে যেন অনন্ত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল সোমনাথ?

অশনিনাথ আর শিশির গাড়িভর্তি নানা রকম সরঞ্জাম নিয়ে বিকেল সাড়ে-চারটেয় ঘনশ্যামগড়ে ফিরে এলেন। অশনিনাথকে শারমা সংক্রান্ত সমস্ত খবর দিলেন উমা। অশনিনাথ সব শুনে দেবকান্ত রাও-এর দিকে ফিরে বললেন,—দেখেছ দেবকান্ত আমার বোন বলে কথা, উমা যদি বুদ্ধি না খাটাত, তাহলে এতক্ষণে শোভনকে নিয়ে বহুদূরে চলে যেত শারমা।

দেবকান্ত সোফায় গা এলিয়ে বসে সব শুনছিলেন আর মিটিমিটি হাসছিলেন। তাঁর ভাবটা হল, তোমরা বলছ, বন্ধু মানুষ,—তাই সব শুনছি। কিন্তু এখনো ঠিক মেনে নিতে পারছি না। ইতিমধ্যে সোমনাথের ফোন এলো। অশনিনাথ সোমনাথকে যা-যা বললেন তা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সবাই। ফোন রেখে দিয়ে সোফায় এসে গা এলিয়ে বসতেই দেবকান্ত বললেন,– সে কী, সোমনাথকে আমাদের দুর্গে আশ্রয় দেবেন না অশনিদা?

—সোমনাথকে দেব না কেন? কিন্তু ওর সঙ্গের মেয়েটিকে এখানে আনার বিপদ আছে! মেয়েটি যে কী ভালো না খারাপ শয়তান না দেবীর অংশ তা তো এখনো জানি না। আজ রাতে কেবল শোভনই আমার চিন্তাভাবনা দখল করে আছে। আজ আমি আর অন্য চিন্তা মাথায় নিতে চাই না। ঠিক সাড়ে-পাঁচটা বাজবে আর ফোনের লাইন কেটে দেব আমরা। হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসব শোভনকে নিয়ে। চাকর বেয়ারাদের বলে দিয়েছো তো উমা ওদের বিল্ডিং-এ চলে যেতে?

দেবকান্ত বললেন,—সে কী. চাকর বেয়ারারা সত্যিই আমাদের মহলে থাকবে না?

—আমি তো আগেই বলে দিয়েছি সে কথা! উমাকে বলেছি তোমার ঘনশ্যামগড় যেভাবে ঘেরা আছে, পাহারার ব্যবস্থা আছে, তাতে জাগতিক শত্রুর কোনো আক্রমণের ভয় আমাদের নেই। আমাদের ভয় অন্য অতি-জাগতিক শত্রুর জন্য।

টেলিফোন আসতেই অশনিনাথেরকথার উত্তর না দিয়ে দেবকান্ত উঠে গেলেন।

অশনিনাথ শিশির আর উমাকে নিয়ে চলে গেলেন লাইব্রেরী ঘরে। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে অশনিনাথ খুশী হলেন। তারপর তিনি দ্রুত কাজ শুরু করে দিলেন।

ঘরের মাঝখানের বিশাল শয্যাবেদীকে কেন্দ্র করে, সঙ্গে আনা অদ্ভুত ধরনের রঙীন গুঁড়ো দিয়ে একটি পাঁচকোণা বিশাল তারকা আঁকলেন। তারকার মাথায় মাথায় সরার ওপর রাখলেন নানান রকম সামগ্রী। প্রতিটি সরার মাথায় রইল স্বতোয়ার জলভরা ঘট। ঘটের পর মাটির দীর্ঘ পিলসুজে তেল-ভরা বড় বড় প্রদীপ। প্রদীপের পর কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ঘরের কোণে কোণে বড় বড় ধুনুচি-ভরা ধুনো রাখা হল। ধুনোর জ্বালানীর জন্য ছোবড়া আর কাঠকয়লা ধূপ-দীপ-ফুল দিয়ে সাজানো হল ভিতরের দেয়াল। এসব করার পর৷ অশনিনাথ শোভনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। উমা বললেন—তাকে সুস্থ করে পরিষ্কার পোশাক পরিয়ে শরবত খেতে দেওয়া হয়েছে।

অশনিনাথ বললেন, এবার তাহলে আমরা স্নান সেরে খেয়ে নিই। আর তোমার মেয়ে হাসি?

—হাসিকে রানী খাইয়ে-দাইয়ে দেবে, রানী ওপরে নার্সারীতে থাকছে, আর রানীর সঙ্গে থাকছে আমার দুজন খাস চাকরানী।

অশনিনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, খাস চাকরানী? কদ্দিনের পুরোনো?

—বহুদিনের। রানীরই দুই ভাইঝি!

বেশ, তাহলে তারা থাকতে পারে। চলো স্নান সেরে নিই।

স্নান সেরে খাওয়ার টেবিলে এসে বসলো সবাই।

সামান্য আয়োজন, আলুসিদ্ধ, মাখন, গরম রুটি, কলা, ক্ষীর আর ফলের রস।

দেবকান্ত নীচু হয়ে খাচ্ছিলেন। কোনো কথা বলছিলেন না। উমা খানিকক্ষণ তাঁর মুখের গম্ভীরভাব লক্ষ্য করে বললেন,—কি ব্যাপার? এত রাগ-রাগ ভাব কেন?

—ত্যুৎ, এইসব নিরামিষ ছাতামাথা কখনো খাওয়া যায় ?

উমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে অশনিনাথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার দেবকান্তকে বললেন—না হয় একদিন অমন একটু নিরামিষ খেলেই—

—আসলে আমি এসব কিচ্ছু বিশ্বাস করি না !

অশনিনাথ চমকে তাকালেন। তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হল নিমেষের জন্য। তারপর কি যেন গভীরভাবে ভেবে নিলেন তিনি। মুখের রেখাগুলি আবার কোমল হয়ে এলো ঈষৎ। হেসে বললেন—দেবকান্ত তখন কে ফোন করছিল তোমায় ?

দেবকান্ত চমকে তাকালেন অশনিনাথের দিকে। অশনিনাথ স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন দেবকান্তর দিকে।

—বলো ? কে ফোন করেছিল ? কি বলেছিল ফোনে ?

দেবকান্তর চোখের দৃষ্টি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি বললেন—দুঃখিত অশনিদা। আমার যে মাথার মধ্যে কি হচ্ছিল কি বলব ? শারমা ফোন করেছিল আমাকে। ফোনে ওই একই কথা বলছিল—যা উমাকে বলে গেছে। কিন্তু লোকটার গলার স্বর আর বলার ভঙ্গীটা এমন—

অশনিনাথ বললেন-ওই জন্যেই বলছিলাম উমা ফোনের লাইনটা কেটে দাও। সারা জগৎ থেকে আজ আমাদের লাইব্রেরী ঘরটিকে ডিস্‌কানেকট্‌ করে ফেলতে হবে। সীল করে রাখতে হবে। শারমা কণ্ঠস্বর দিয়েই দেবকান্তকে কতখানি বশীভূত করে ফেলেছে তোমরা লক্ষ্য করো।

উমা বললেন—আপনি তো অশনিদা ওকে দিব্যি অ্যানিটডোট্‌ দিলেন।

অশনিনাথ বললেন—অর্থাৎ !

—অর্থাৎ, আপনি ওর দিকে কি ভাবে তাকিয়েছিলেন তা তো স্বচক্ষে দেখলামই আমি।

অশনিনাথ বললেন—ও কিছু না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আর একপ্রস্থ পোশাক পরিবর্তন করে, চলো আমরা শোভনকে নিয়ে আজকের রাতের মতো লাইব্রেরী ঘরে ঢুকি।

প্রথম চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন অশনিনাথ।

ঘনশ্যামগড় দুর্গে এখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঘরের মাঝখানের শয্যায় শোভন শুয়ে আছে। তার কাছে বসে আছে উমা, শিশির আর অশনিনাথ। ঘরের একদিকে জ্বলছে একটি একশো পাওয়ারের আলোর বাল্ব। বলতে গেলে বিশাল ঘরটি ঢেকে আছে আধো আলো-আঁধারিতে। ধুনুচিতে জ্বলছে ধুনো। তার ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপরের ভেন্টিলেটার দিয়ে। পাঁচকোণা তারার পাঁচটি কোণে জ্বলছে অকম্প্রশিখা-প্রদীপ। শোভন ক্লান্তি আর আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেন এলিয়ে আছে। কিন্তু বোঝা যায় বন্ধুদের মাঝখানে থাকার স্বস্তিটা আবার আস্তে আস্তে ফিরে আসছে তার ভিতরে। একটি-দুটি কথা বলছে সবাই। সাধারণ কথা। ক্রমশঃ কথার সংখ্যা কমে আসতে লাগল। শিশির লক্ষ্য করল সবাই কেমন যেন বাক্যহারা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বাইরের ঘরের ফেরা পাখীদের কাকলী কখন যেন টুপটাপ স্তব্ধতায় ডুবে হারিয়ে গেল। গড়ের এই মহাল ছেড়ে দূরে চলে গেল চাকর বেয়ারারা। এমনিই বিশাল দুর্গটি নির্জন। তায় টিলার উপর দুর্গ আর দুর্গসন্নিহিত বাগান ছাড়া কিছু নেই। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট চৌকি। কেবল পেটাঘড়িতে মাঝেমাঝে সময় সঙ্কেত। এইমাত্র সাতটা বেজে গেল। চারিদ্দিক বন্ধ থাকায় মনে হচ্ছে যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে ঘড়ির শব্দ।

শিশির কান পেতে শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল সে যেন নিস্তব্ধতার শব্দ শুনতে আরম্ভ করেছে।

শব্দহীন সেই শব্দ কানের ভিতর দিয়ে আরো গভীরে পৌঁছে অদ্ভুত একটা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

বহুদূর থেকে যেন মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল রাত-পাখীর ডাক। কখনো কখনো পেঁচার চিৎকার।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ শোভন কেমন যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো এলানো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে চারিদিকে তাকাতে লাগলো সে।

মনে হতে লাগলো, যেন তার কাছে শিশির, অশনিনাথ, দেবকান্ত, উমা সবাই-ই কেমন যেন অপরিচিত হয়ে গেছে। ক্রমশঃ বন্ধুত্বের ছোঁয়া পরিচিতির আলো তার মুখের রেখা থেকে নেমে যেতে লাগলো। যেন কেমন বিরুদ্ধ হয়ে উঠলো সে। অস্ফুটস্বরে বলল,—তোমরা আমায় বন্দী করে রেখেছো কেন ছেড়ে দাও--যেতে দাও আমাকে !

দেবকান্ত বললেন—কোথায় যাবে তুমি শোভন ?

অশনিনাথ ইশারায় বললেন—কোনো কথা বলে লাভ নেই শুধু ওকে স্পর্শ করে বসে থাকতে হবে সবাইকে।

শিশির চাপা গলায় বলল,—অশনিদা, এত যে সব সাবধানতা নিলেন, এতেও তো কিছু হল না। শারমা ঠিক টানছে শোভনকে।

অশনিনাথ বললেন—টানবেই তো। আমি তো তা জানতাম। ত্যাখো, শারমা আমাদের সকলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করছে। তোমায় বলি, আমি জানি লাইব্রেরী ঘরের বাতাসের, শুন্যতার প্রতিটি 'আয়ন'কে যদি শুদ্ধ করতে পারতাম তাহলে হয়তো শারমা আর তার দলের শয়তান সাধকেরা ওভাবে তাদের মিলিত আকর্ষণ, সম্মোহনী শক্তি পাঠাতে পারত না। হয়ত প্রতিটি 'আয়ন'কে সেভাবে শুদ্ধ করতে পারিনি। তবে আমাদের মানসিক শক্তি শোভনের চেয়ে অনেক গুণ বেশী বলে আমরা ওই টানের কোনো রকম বোধ পাচ্ছি না।

শোভনের কাছে সরে গিয়ে অশনিনাথ তাকে দু-হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরে কানের কাছে সম্ভবতঃ চণ্ডী থেকে কোনো শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

আস্তে আস্তে শোভনের অস্থিরতা খানিকটা কমে এল।

তারপর আবার নিস্তব্ধতা। গলাচাপা নিশ্চুপ সময় শিশির হাত ঘড়ির দিকে তাকালো। মনে হচ্ছিল যেন অনেকখানিটা রাত হয়ে গেছে। ঘড়িতে মাত্র নটা।

স্তব্ধতা যেন ক্রমশঃ গলাচাপা হয়ে উঠতে লাগল। শিশির দেখল হাঁটুতে থুতনি রেখে, এক হাতে শোভনকে ছুঁয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উমা। অশনিনাথ পদ্মাসন হয়ে স্থির বসে আছেন। তিনিও

একহাতে ছুঁয়ে রেখেছেন শোভনকে। দেবকান্ত কেমন যেন অস্থির আড়মোড়া ভাঙছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করছেন মাঝে মাঝে। খানিক পরে দেবকান্ত বললেন জানেন অশনিদা এখন মনে হচ্ছে সঙ্গে বেশ একটা বইটই থাকলে ভালো হত।

—সে কী?

চমকে উঠলেন অশনিনাথ।

—আজ বইও চলবে না। আজ কেবল মন স্থির করে শুভচিন্তা শুভ ভাবনা আর শোভন যাতে শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পায় তার জন্য প্রার্থনা জানানো।

—না, না, বই ছাড়া আমি থাকতে পারছি না। আমার গলা চেপে আসছে, ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হচ্ছে।

অশনিনাথ একটু গভীরদৃষ্টিতে তাকালেন দেবকান্তর দিকে। দেবকান্ত মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠেছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে, যেন সবাই তার পরম শত্রু।

অশনিনাথ ইশারা করে উমাকে বললেন, দেবকান্তকে ছুঁয়ে থাকতে।

উমা তাড়াতাড়ি দেবকান্তর গায়ে হাত ছুঁইয়ে হেসে বলল, কি, তুমি এত অস্থির অস্থির করছ কেন? কি এমন অস্থির হবার কারণ ঘটেছে?

দেবকান্ত হঠাৎ কেমন যেন রেগে গেলেন। রাগে ফুলতে ফুলতে তিনি বললেন, কি যে লাগিয়েছ তোমরা সবাই মিলে। সারাদিন নিরামিষ খাইয়ে রাখলে। তার ওপর এই রকম একটা বন্ধ ঘরে সন্ধ্যে থেকে বন্দী। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি সব ভেঙে-চুরে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে পালিয়ে যাই।

অশনিনাথ তাড়াতাড়ি বোতলে রাখা বিশেষভাবে শোধন-করা জল ছোট গ্লাসে ঢেলে উমার হাতে দিলেন। উমা জলটা দেবকান্তকে প্রায় জোর করে খাইয়ে দিয়ে বললেন পিপাসা পেয়েছিল খুব তাই না? জানেন অশনিদা আজকাল ওর একটু একটু প্রেসারের ভাব দেখা দিচ্ছে।

অশনিনাথ বললেন, তাই নাকি দেবকান্ত ?

শিশির অবাক্ ভয়ে দেখলো, দেবকান্তর মুখ থেকে বিরক্তির রেখাগুলি সব মুছে গেছে। মুখের ভাবটি আবার সমাহিত, শান্ত।

এবার সবাই যেন আবার মনে মনে একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। আবার যেন পুরোনো মনের টানগুলো ফিরে এলো।

ঘড়ির টিক্ টিক্ ক্রমশঃ এগোচ্ছে। দূরে পেটাঘড়িতে রাত বারোটা বাজল।

হঠাৎ মনে হলো ঘরের আলো ঈষৎ কমে যাচ্ছে। যেন কারেণ্ট্-এর ইনটেনসিটিটা আস্তে আস্তে ফল করছে। লাইট ফিউজ হয়ে যাবার মুখে।

এ লক্ষণ শিশির আর অশনিনাথের দিব্য চেনা। হঠাৎ বাইরের ঘেরা বারান্দার নিস্তব্ধতা ভেঙে উঠে এলো জুতোর মশ্‌মশ্‌ শব্দ। লাইব্রেরী ঘরের দরজার ঠিক সামনে এসে থামল শব্দটা। পরিষ্কার শোনা গেল সোমনাথের গলা।

—দেবকান্ত, দেবকান্ত, উমা, উমা, দরজা খোলো। আমার ভীষণ বিপদ ভিতরে ঢুকতে দাও—ঢুকতে দাও আমাকে। চম্‌কে উঠল শিশির। উঠে দাঁড়াল সে।

অশনিনাথ বললেন—কি হলো শিশির উঠে দাঁড়ালে কেন ?

শিশিরের চোখের সামনে তখন কেবল ভাসছে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের একটা ভয়াবহ ছবি, যেন এক অজানা আতঙ্ক এগিয়ে আসছে নীচের পাহাড় বেয়ে, সোমনাথের পিছন পিছন। আক্রান্ত অবস্থায় প্রায় সোমনাথ দাঁড়িয়ে দরজা ঠেলছে। সোমনাথকে বাঁচাতেই হবে। সে বলল দরজা খুলে দিই অশনিদা, দেখছেন না সোমনাথের বিপদ।

—ও সোমনাথ নয়।

—স্পষ্ট শুনছি সোমনাথ ডাকছে !

বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত উত্তাল হয়ে উঠছিল। সোমনাথ পাগলের মতো আকুল হয়ে ডেকে যাচ্ছে—

—খোলো দরজা খোলো উমা, দরজা খোলো দেবকান্ত, খোলো—

এবার শিশিরের সঙ্গে দেবকান্তও উঠে দাঁড়ালেন।

অশনিনাথ দেখলেন উমাও কেমন যেন ছটফট করছে। অশনিনাথ এবার চেঁচিয়ে উঠলেন,—আচ্ছা শিশির, দেবকান্ত তোমরা কেবল গলা শুনেই বুঝে ফেলছ বাইরে সত্যিই সোমনাথ দাঁড়িয়ে আছে? সোমনাথ যদি সত্যিই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে সে সবার আগে, আমাকে ডাকত। তাছাড়া সে একা বিপদে পড়ে ড্রিমল্যাণ্ড হোটেল থেকে পালিয়ে আসবে, এমন ধারণা আমার নয়। সে ভীরু নয়। সে ঠিক চন্দ্রাকে নিয়েই আসত। তোমরা একটু যুক্তি দিয়ে কথাটা ভাবছ না কেন?

শিশির আচ্ছন্নের মতো অশনিনাথের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে তার মাথার ভিতর যুক্তি ফিরে আসতে লাগল। দেবকান্তও কিছুটা শান্ত হল। শিশির আস্তে শোভনের পাশে বসে পড়ল। ঘরের আলোয় আবার ক্রমশঃ উজ্জ্বলতা ফিরে আসতে লাগল। বাইরে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল সোমনাথ যেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সরে সরে দূরে চলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ঘরের একটি মাত্র আলোর বাল্ব্ ফিরে এলো নিজস্ব উজ্জ্বলতায়।

অশনিনাথ শান্ত হলেন কিছুটা। তিনি হেসে বললেন—উমা, দেবকান্ত, বুঝতে পারছ কি ভীষণ বিপদের মধ্যে আমরা আছি। এই বিপদে তোমাদের সাহায্য যে কত কাজে লাগছে, তা বলে বোঝানো সম্ভবপর নয়।

হঠাৎ ঘরের আলো আবার কেমন যেন ম্লান হয়ে আসতে লাগল। অশনিনাথ আক্রমণ হবার আগেই তাড়াতাড়ি পঞ্চ তারকার বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধুনুচির নিভন্ত আগুনে দিলেন বড় বড় কাঠকয়লা। তার ওপর ফেলে দিলেন আঁজলা আঁজলা ধুনো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। কাঠকয়লাগুলো জ্বলে লাল টকটকে হয়ে উঠলো। গন্ গন্ করতে লাগল আগুন, কিন্তু কি আশ্চর্য বন্ধ ঘরের মধ্যে ধুনুচির স্তূপাকার কাঠকয়লার গনগনে উত্তাপের আঁচ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অতি-প্রাকৃত ঠাণ্ডা নামতে লাগলো। মনে হতে লাগলো ঠাণ্ডা থলথলে জেলির মতো একটা বস্তু জমে উঠছে

মেঝের ওপর। আস্তে আস্তে সেই জোলো ঠাণ্ডা যেন চেটে নিতে লাগলো ধুনুচির আগুনকে। আগুন মরতে মরতে, কমতে কমতে, বিদ্যুতের বাল্বের সঙ্গে তাল রেখে একেবারেই যেন মিলিয়ে গেল। যেতেই ঘরের কোণের দিকের একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল।

উমা চম্‌কে উঠলো—অশনিদা, দরজাটা খুলল কি করে ?

অশনিনাথ চম্‌কে তাকিয়ে দেখলেন, দরজা খুলে ঢুকছে ছোট্ট হাসি। হাসির পরনে রাত-পোশাক। সে উমার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

উমা লাফিয়ে উঠলেন,—হাসি, হাসি নীচে নেমে এলো কি করে ? নীচে আসার সিঁড়ির দরজাটা তো আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি—হাসি,—হাসি, আয়, ওখানে দাঁড়াস নি এখানে আমার কোলে আয় !

কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকারে হাসি একটা কাঁচ কাঁচ নাইটড্রেস পরে কান্নার ভঙ্গীতে কেবলই হাত বাড়িয়ে যাচ্ছে।

উমা পাগলের মতো পঞ্চতারা থেকে বেরোতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কি আশ্চর্য ! দেবকান্ত কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। তিনি হাসির দিকে কিছুতেই যেতে দিলেন না উমাকে। বললেন, উমা, উমা, পাগলামি করো না স্থির হও। একটু স্থির হও।

হঠাৎ দেখা গেল ঘরের যে প্রান্তে হাসি দাঁড়িয়ে আছে তার আর একপ্রান্তে একটি গোল ছাইরঙের কোমল বস্তুপিণ্ড তৈরী হয়েছে। পিণ্ডটি থেকে ক্রমশঃ দুর্গন্ধ বেরোতে লাগলো। হঠাৎ দেখা গেল পিণ্ডটি ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে ক্রমশঃ আকারে বিরাট হয়ে উঠছে। ক্রমশঃ পিণ্ডটি একটা নির্দিষ্ট আকার নিতে লাগল। বিরাট উঁচু হিংস্র একটা রোমশ বিড়াল হয়ে উঠলো সেটা। ছাইকালো অতীন্দ্রিয় সেই বিড়ালের চোখ দুটিতে বেগুনী সবুজ অঙ্গার জ্বলছিল যেন। চার পায়ের নখে চমকাচ্ছিল ইস্পাতের কাঠিন্য। আস্তে আস্তে সে অতিকায় বেড়াল এগোতে লাগল হাসিকে তাক করে। হাসি যেন তাকে দেখে আরো শিউরে আরো গুটিয়ে দুহাত মেলে উমাকে ইশারা করতে লাগলো। উমা ছুটে বেরিয়ে যাবেনই—দেবকান্ত আর শিশির প্রাণপণে ধরে রইলেন তাঁকে। অশনিনাথ কঠিনকণ্ঠে বললেন—

ছিঃ উমা, হাসির একটা মিথ্যে মূর্তি দেখে তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে। ও মূর্তি তো হাসির নয়। তোমার খেয়াল নেই হাসি ওই দরজা দিয়ে আসতেই পারে না। দরজা তো সীল করা। বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দরজাও তো খোলা নেই। তৃতীয়তঃ ওই মূর্তি কি সত্যিই হাসির? হাসি হলে তোমাকে ডাকত না। তোমার কাছে ছুটে আসত। হাসি হলে কেবল হাত বাড়িয়ে দিত না, মা মা করে ডাকত, হাসি হলে—ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, তার ঠোঁট অমনি নীল, নিষ্ঠুরের মতো হত না। চোখে জ্বলত না ওই রকম ভয়ঙ্কর সবুজ আলো। ও হাসি নয়—তোমাকে পঞ্চতারা থেকে বের করে এনে শারমার দলের সামিল করবার জন্য ওই ভয়ঙ্কর আয়োজন। তুমি স্থির হয়ে বসো। এই চরণামৃতটুকু খাও। তারপর ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকো।

উমা তাড়াতাড়ি চরণামৃতটুকু খেলেন। তারপর একহাতে দেবকান্ত এবং একহাতে শিশিরকে ধরে স্থির হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের সামনে সেই বিরাট বিড়াল থাবা বাড়িয়ে আস্তে আস্তে হাসিকে ধরলো। তারপর দুটো মূর্তি ক্রমশঃ পরিণত হতে লাগল গোল একটা বিরাট বস্তুপিণ্ডে। বস্তুপিণ্ডটা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে ছোট হতে লাগলো ক্রমশঃ। তারপর তিলমাত্র হয়ে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে টুক্‌টাক্ আবার জ্বলে উঠলো আগুনের ফুলকি। কাঠকয়লাগুলো একটু একটু করে জ্বলে জ্বলে লাল হয়ে উঠলো আবার। আলোর বাল্বটাও উঠলো জ্বলে।

অশনিনাথ বললেন, –তাকিয়ে দেখো উমা, হাসি যে দরজা খুলে ঢুকেছিল সে দরজা বন্ধই রয়েছে। হাসি আসলে নীচে আসেই নি।

উমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। উমা বলল—অশনিদা এ কি ভীষণ ব্যাপার। এ আতঙ্কের কল্পনাই তো আমার মধ্যে ছিল না। কি ঘটে গেল বলুন তো?

ইতিমধ্যে আবার আলোর বাল্ব তার নিজস্ব জ্যোতি হারাতে আরম্ভ করেছে। আস্তে আস্তে বাল্ব থেকে সব আলো মুছে গিয়ে জ্বলতে লাগলো কেবল তারটুকু। সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে ওরা শুনলো বাইরের

নিস্তব্ধতা ঝড়ো হাওয়ায় খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। পেটা ঘড়িতে একটা বাজার ঘণ্টা যেন সেই সাইক্লোনের শব্দ ভেদ করে বেজে গেল।

অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন,—এবার প্রচণ্ড বিপদ, প্রচণ্ড বিপদ আসছে কিন্তু। এসো, মনোবল তৈরী করো। সবাই মিলে চেষ্টা করো। এ বিপদকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে রুখতে হবেই। রুখতেই হবে!

এক অন্ধকার ঘরে, পঞ্চতারার গণ্ডীর মধ্যে বসে পাঁচজন মানুষ যেন সারা পৃথিবীর পরিচিত নিয়মের গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়েছে। অশনিনাথের কথায় হাতে হাত বেঁধে বেঁধে সবাই বসে গেলেন। এমন কি অর্ধশায়িত শোভনও। বাইরের প্রবল সাইক্লোনে যেন সারা লাইব্রেরী ঘরটা কাগজের ঠোঙার মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল। অশনিনাথ বললেন,—শারমা এবার যাকে পাঠাচ্ছে তাকে সে গড়েছে একটা আত্মার সম্পূর্ণ শক্তিকে উৎসর্গ করে। এই আক্রমণ ঠেকানো কিন্তু সত্যিই আমাদের পক্ষে ভয়নক কষ্টকর হয়ে পড়বে।

অশনিনাথের কথা শেষ হতে-না-হতেই ঝড়ের বেগ এবং হাওয়ার শব্দ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠলো যে লাইব্রেরী ঘরের মুখ্য দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল খানিকটা বেগুনী ধরনের আলোর ঢেউ-এর মাঝখানে একটি ছায়ামূর্তি দুলতে দুলতে ভিতরে ঢুকলো তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন,—শিশির এবার কিন্তু দরজা সত্যিই খুলেছে—

ঘরের মধ্যে এবার প্রবল শৈত্যপ্রবাহ বইতে লাগল যেন। নিঃসীম অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করে নিচ্ছে। এত চাপচাপ অন্ধকার শিশির এর আগে কখনো দেখেনি। সেই ঠাণ্ডাহিম অন্ধকারে ওরা পাঁচ জন যেন জমে যেতে লাগল। পরস্পরের কাছাকাছি সরে এলো সবাই। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন—শোভনকে সবাই মিলে ঘিরে ধরো। ছেড়ো না কিছুতেই।

সবাই যেন আঁকড়ে ধরল শোভনকে। হাতগুলি যখন পরস্পরের হাতে ঠেকতে লাগল তখন শিশিরের মনে হল থরথর করে কাঁপছে

হাতগুলো। যেন পৃথিবীর শেষকণা তাপটুকুও নিংড়ে নিয়েছে কেউ। চতুর্দিকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এমনিই মর্মান্তিক ঠাণ্ডা।

সেই ঠাণ্ডার মধ্যে ঘরের কোণে, যেখানে সেই আবছা ছায়ামূর্তিটা আছড়ে পড়েছিল, সেখানে দেখা গেল আবছায়া একটি বিন্দু। বিন্দুটি লাফাচ্ছে যেন। লাফাতে লাফাতে ক্রমশঃ বড় হতে থাকল সেটি, খুব দ্রুত চেহারা পালটাতে পালটাতে এক বিরাটাকৃতি অশ্বে পরিণত হল। সেই অশ্বের চেহারা কিন্তু ঘোড়ার মতো সৌন্দর্য কিংবা বীর্যমণ্ডিত নয়। কেমন যেন অদ্ভুত। অশ্বটি গড়ে ওঠা মাত্র সারা ঘর ভরে গেল আঁষটে একটা গন্ধে। মনে হল কে যেন অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে আছে। সে অদৃশ্য, কিন্তু সে আছে। রেকাবে তার টান করা অদৃশ্য পা। লাগামও তার টান করে ধরা। একটানে ঘোড়া লাফিয়ে উঠলো ওপরে। শূন্যে। তার পায়ের ক্ষুরগুলো শানানো ব্লেডের মতো ঝকঝক করছে হাঁ করলে বড় বড় হলদে দাঁত ঝলসে উঠছে। নাক দিয়ে বেরোচ্ছে নীল আগুন। চোখ দুটো ক্রোধে ঘৃণায় খয়েরী আগুন ছড়াচ্ছে। ঘোড়াটি চক্কর শুরু করল। মাথার ওপর কড়িকাঠের চারিদিক গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ঘোড়াটি। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠলো শোভন।

—আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—আমাকে ডাকছে—আমাকে নিতে এসেছে—ওরা আমাকে নিয়ে যাবে—

অশনিনাথ শোভনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরিয়ে বললেন, না, শোভ
না, তোমাকে আমরা সবাই আটকে রাখবো।

—ও মৃত্যু, ও মৃত্যু—সাক্ষাৎ মৃত্যু—ও আমায় ডাকছে—আ
ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি—ওই আমার সব। ও-ই আমার সবকিছু
নিয়ামক—আমি যাই—আমি যাচ্ছি—

উমা বললেন—শোভন, শোভন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শুনু
ভাই—শুনুন—

শোভনের গায়ে যেন আসুরিক শক্তি। কিছু যেন শোভন
মারাত্মক টানছে। শোভনের দেহটা পঞ্চাতারার মধ্যে থেকে ছু

বেরিয়ে গেল একেবারে তারকার প্রান্তে। তার হাতের ধাক্কা খেয়ে একটি ঘট উল্‌টে পড়ল। স্বতোয়ার পূত সলিল উপ্‌চে পড়ল। অশনিনাথ তাড়াতাড়ি দেবকান্তর হাতে শোভনকে তুলে দিয়ে উল্‌টে পড়া ঘটটি নতুন করে ভর্তি করে দিলেন। ব্যর্থ চেষ্টা করলেন প্রদীপ জ্বালাতে। দেশলাই জ্বলল না। ইতিমধ্যে সেই মৃত্যু ঘোড়ার বেগ আরো বেড়েছে। গরম ভাপ এসে লাগছে সকলের গায়ে। গা জ্বলছে সকলের। শোভনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। তার উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। চারজন মিলে তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই ভীষণ ঘোড়া নেমে এলো অনেক নীচে। মনে হলো তার ক্ষুরের আঘাতে মাথা ফেটে যাবে সবাইয়ের। সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত শোভনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

অশনিনাথ পাগলের মতো চিৎকার করে অসতো মা সদগময়ো মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই ভীষণ অশ্ব দ্রুত নেমে আসতে লাগলো ছোঁ মারার ভঙ্গীতে—এক পলকের জন্য তখনই তারা মৃত্যুর মুখ দেখতে পেল। জ্ঞান হারাবার আগে সেই মুখ দেখে চমকে উঠলেন অশনিনাথ। চেনা মুখ। শিশিরও ভাবলো এ মুখ কোথায় যেন দেখেছে—যেন চন্দ্রা মেয়েটির মুখের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে—

নেমে আসা ঘোড়ার ভয়ঙ্কর হ্রেষাধ্বনির পর আর কোনো সাড়াশব্দ উঠলো না। সমস্ত ঘরে দুটি অচেতন দেহের ওপর নেমে এলো কবরের স্তব্ধতা।

সোমনাথের যখন চেতন হল তখন ঘরের আলো ধূ-ধূ করে জ্বলছে। দরজা জানলা সব হাট করে খোলা।

চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সোমনাথ বুঝতে পারল চন্দ্রা কটেজে নেই। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরোল। ভয়, হতাশা, অনুতাপ তার মধ্যে তখন পাগলের মতো পাক খেতে আরম্ভ করেছে।

খানিকটা চিন্তার পর সোমনাথ ড্রিমল্যাণ্ড হোটেলের মালিককে জাগিয়ে একটি গাড়ি ও কুশলী অভিজ্ঞ ড্রাইভার যোগাড় করল। আর কোনো পথ নেই। এবার তাকে ঘনশ্যামগড় দুর্গে যেতেই হবে।

অশনিনাথ তার যত বড় বন্ধুই হোক না কেন, চন্দ্রার যদি ভালোমন্দ কিছু হয় তাহলে তাঁকে জবাবদিহি করতেই হবে।

মধ্যরাত্রির উঁচু নীচু জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে ঘনশ্যামগড়ের দিকে চলল তার ভাড়া করা গাড়িটা। এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘনশ্যামগড়ে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু গাড়িটা যেন একই রাস্তায় পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে বলে মনে হতে লাগলো তার। ঘড়িতে এক ঘণ্টা কখন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সোমনাথের রাগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। এই কুশলী অভিজ্ঞ ড্রাইভার? লোকটা কি পাহাড়ী পথটথ সত্যিই জানে। বেরোবার সময় তো বলল সব ওর জানা আছে। নাকি নেশাটেশা করেছে লোকটা? হোটেলের ম্যানেজারের ওপরও রাগ হতে লাগল সোমনাথের। জেনেশুনে এমন একটা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিল সোমনাথকে।

অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তায় শৃগালের কান্না পেঁচার আর্তস্বর শুনতে শুনতে সোমনাথের কেমন ঝিম লাগতে লাগলো। হঠাৎ সমস্ত ঝিম্‌কে বিদ্যুৎচমকের মতো তার সামনে দিয়ে ছুটে ওপর দিকে উঠে বাতাসে ফেটে পড়ল একটা ছাই বর্ণের অতিকায় উড়ুক্কু প্রাণী। ঠিক যেন অলৌকিক ঘোড়ার মতো।

সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল সব ঘুম। সে চম্‌কে তাকালো চারিদিকে। সামনের সিট থেকে ঝিমন্ত ড্রাইভার সোজা হয়ে বসে হেডলাইটের আলোর কোনো নিশানা দেখে চম্‌কে উঠে পরিষ্কারগলায় বলল,—ছি ছি, আমি এ কী করছিলাম স্যার এতক্ষণ! এ তো ভুল রাস্তায় ঘুরে' বেড়াচ্ছি আমরা। ইস্‌ রাত শেষ হয়ে এলো। চলুন, তড়িঘড়ি আপনাকে ঘনশ্যামগড়ে নিয়ে যাই।

এবার গাড়ি ছুটলো নির্দিষ্ট পথে স-বেগে। ঘনশ্যামগড় দুর্গের প্রথম চৌকির কাছাকাছি গাড়ি এসে পৌঁছোতেই গাড়ির সামনে কি যেন একটা পড়তেই ব্রেক কষল ড্রাইভার।

—একটা মানুষ পড়ে আছে স্যার!

ধ্বক্‌ করে উঠলো সোমনাথের বুকটা। চন্দ্রা নয় তো?

সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নামলো। হেডলাইটের আলোর বন্যায় পরিষ্কার দেখা গেল লোকটাকে। শারমা। শারমা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছিন্নভিন্ন তাব শরীর। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

সোমনাথ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল—চলুন, জল্‌দি ঘনশ্যামগড়।

প্রথম চৌকিতেই বাধা পেল সোমনাথ। পাহারাদার জানালো ওপরে যেতে মানা আছে। রাত ভোর না হলে, আদেশ না পেলে ছাড়তে পারবে না সোমনাথকে। সোমনাথ হতাশ হয়ে গাড়ির ভিতরেই চুপচাপ বসে রইল।

ভোরের পাখির ডাকে প্রথম ঘুম ভাঙলো উমার। উঠে দেখল শোভন ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত বোধ করল উমা। দেবকান্ত অশনিনাথ আর শিশিরও ঘুমোচ্ছে। উঠে বসে উমা দেখলো দূরে ঘরের কোণে একটি মানুষ পড়ে আছে। সে কি করবে স্থির করতে না পেরে অশনিনাথকে ডাকল।

অশনিনাথ উঠে কতকগুলি প্রক্রিয়া সেরে উমাকে বললেন—চলো উমা, এবার আমরা পঞ্চতারার আঁটান থেকে বেরোতে পারি।

দুজনে এসে দেখলেন একটি নারীদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অশনিনাথ নাড়ী ধরে দেখলেন, কোনো স্পন্দন নেই। চন্দ্রা মৃত। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠলো অশনিনাথের মন। সোমনাথকে আশা দিয়েও তিনি আশা পূবণ করতে পারলেন না। চন্দ্রা শেষ পর্যন্ত মারা গেলই। যাক্ তবু মন্দের ভালো শোভন বেঁচেছে। কাল রাত্রে মৃত্যু স্বয়ং এসেছিল শোভনকে নিতে। মৃত্যুকে জয় করেছে শোভন। মৃত্যুকে শারমা তৈরী করেছিল চন্দ্রার আত্মার সহায়তা নিয়ে। চন্দ্রার শরীর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছিল মৃত্যুর পৈশাচিক আকৃতি। সেই মৃত্যু যখন শোভনকে অধিকার করতে পারল না তখন আর কাউকে না পেয়ে ফিরে গেল চন্দ্রারই কাছে। চন্দ্রাকেই করল নিহত। শোভন সুস্থ হয়ে উঠে বসল বিছানায়। শিশির আর দেবকান্তও। ভয়ঙ্কর রাত্রি কেটে গেছে। এখন শান্তি, স্বস্তি। উমা শোভন শিশির আর দেবকান্তকে বাইরে স্নান খাওয়া করতে পাঠিয়ে

দিয়ে অশনিনাথ চন্দ্রার দেহটি তুলে পঞ্চতারার মাঝখানে শোয়ালেন। চন্দ্রা যেন ঘুমুচ্ছে। তার চারপাশে জ্বেলে দিলেন সুগন্ধী দীপ। তাঁর দুচোখ জলে ভরে এলো। আহা মেয়েটি আরো বেশী কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিল। চন্দ্রার প্রাণহীন দেহের সামনে অশনিনাথ স্থির হয়ে বসে আছেন এমন সময় বিস্রস্ত সোমনাথকে নিয়ে ঢুকলো উমা। দেবকান্ত শিশির আর শোভন পিছনে দাঁড়িয়ে।

সোমনাথ চিৎকার করে উঠল বুক ফাটিয়ে—অশনিদা, আপনি চন্দ্রাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন—তাকে বাঁচানোর চেষ্টাও করলেন না একটুও। এখন সারাজীবন আমি কেবল নিজেকেই দায়ী করে যাবো চন্দ্রার মৃত্যুর জন্য। আমি যে তাকে বড় মুখ করে বলেছিলাম—বাঁচাবো, বাঁচাবো…

সোমনাথ ছুটে গিয়ে চন্দ্রার বুকে মাথা রেখে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো। হঠাৎ শিশির দেখল চন্দ্রার চোখের পল্লব থরথর করে কাঁপছে। সে কাছে এগিয়ে গেল ভালো করে দেখবার জন্য। ধূপের মৃদু ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আবছা করে দিচ্ছিল চন্দ্রার চারিদিক। না, সত্যিই চন্দ্রা চোখ মেলছে। তার ঠোঁট নড়ছে। সে যেন কি বলতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন অশনিনাথ। চন্দ্রাকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি সোমনাথকে সরিয়ে দিয়ে। আস্তে আস্তে চন্দ্রার দেহে প্রাণস্পন্দন ফিরে আসছে।

কিন্তু তা কি করে হয়?—তবে সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু কার দিকে ছুটে গেল?

অস্ফুটকণ্ঠে অশনিনাথ বললেন— কে, কে মরল সেই মৃত্যু পিশাচের আক্রমণে?

সোমনাথ চমকে উঠে বলল—রাস্তায় শারমার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি, ঘনশ্যামগড়ের প্রথম চৌকির কাছে!

অশনিনাথের মুখে আনন্দ ঝলসে উঠল।

—বুঝেছি। অল্পক্ষণের জন্য চন্দ্রার শরীরে প্রাণ ছিলই না বলতে

গেলে। নাড়ী পাই নি তার ঘোর দুর্বলতার জন্য। মৃত্যু তাহলে তার স্রষ্টাকেই চিরতরে শেষে করে দিয়ে গেছে।

রাতে খাবার টেবিলে সেদিন বিপুল আয়োজন।

উমা আর দেবকান্ত সাধ মিটিয়ে আয়োজন করেছে। খেতে খেতে হাসির খিলখিল হাসি শুনছিলেন অশনিনাথ। আজ সে তাঁর সুপারিশে খাবার টেবিলে একটি আসন পেয়েছে।

শোভন বলল—অশনিদা, আপনি আজ সকালে কি একটি কথা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন। আপনি বলছিলেন শারমা নাকি আমাদের পুরোনো শত্রু। সে-কথা আপনি জানলেন কি করে?

অশনিনাথ বললেন—অনেক পুরোনো কুলজী ঘেঁটেছি শারমার ইতিহাস বের করতে। তোমাদের যে তান্ত্রিক গুরুবংশ ছিল, সে-বংশের একজন আসামের দুর্ভেদ্য অঞ্চলে যায় তন্ত্রসাধনা করতে। সেখানে তার যে ভৈরবী ছিল তার সন্তান হয় একটি। ভৈরবীর পদবী ছিল শারমা। তাই তোমরা যদিও ভেবেছিলে যে তোমাদের গুরুবংশ নির্বংশ হয়েছে, আসলে শারমারা পুরুষ-পরম্পরায় থেকে গিয়েছিল। শারমাদের তান্ত্রিক সাধনা তিব্বতী ভাবধারায়। সেই ভাবধারাকে প্রবল করে তুলেছে শারমার অর্থ, বিদেশী শিক্ষা অভিজ্ঞতা আর শাঁসালো মক্কেলরা। শারমা যখন জানতে পারলো তোমার দাদুর গুলিতে তার শাখা বংশ নির্বংশ হয়েছে তখন রাগে ক্রোধে টাকার লোভে ও বন্ধু সেজে গিয়ে তোমাদের বংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। আসলে এটা শারমার পুরোনো রাগ।

উমা বলল—বাঃ, নতুন তথ্য জানা হলো দেখছি একটি!

দেবকান্ত রাও বললেন—আর একটি নতুন খবর সোমনাথের কাছ থেকে শুনতে চাই—

সোমনাথ হেসে বললেন—চন্দ্রা হ্যাঁ না বললে কি করে নতুন খবর দিই—চন্দ্রা, তোমার হাতের রেখা কি বলে?

চন্দ্রা সলজ্জ মুখে বলল—হাতের রেখা তো যা বলে তা সত্যিই বলে। আমি অল্পক্ষণের জন্যে হলেও প্রায় মরেই তো গিয়েছিলাম।

অশনিনাথ হেসে বললেন—প্রায় কেন? সত্যি সত্যিই। মৃত্যুর শরীর তৈরী করতে গিয়ে তোমার শরীর থেকে প্রায় সব জীবনীশক্তিই নিংড়ে নিয়েছিল শারমা। ওর দৃষ্টি ছিল তোমার ওপর, ওর পুর্বপুরুষদের দৃষ্টি ছিল তোমার মা দিদিমার ওপর। যাক সব যখন মিটেই গেছে তখন তুমি মতটা দিয়েই দাও বাপু। সোমনাথকে চটপট বিয়ে করে ফেল।

দেবকান্ত রাও বললেন—আপনারা কি ভাবছেন এতেই সব নতুন খবর শেষ হয়ে গেল। আমার ঝুলিতে আর একটি নতুন খবর আছে যা শুনলে একজন এখুনি খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে। রীতিমতো বুদ্ধি খরচ করে ব্যাপারটা ঘটাতে হয়েছে আমাকে।

—কে? কে? কে-লাফিয়ে উঠবে?

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। সবারই চোখে সহাস্য কৌতূহল।

দেবকান্ত হাঁক দিলেন—কৈ? সুরভি, বেরিয়ে এসো তো?

এ্যান্টিরুমের লাল ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল সুরভি। শোভনের প্রেমিকা। এবং সত্যিই শোভন চেয়ার ছেড়ে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

—